**KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA**
**18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009**

| | |
|---|---|
| Record No.: KLMGK 2007 | Place of Publication: ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩ |
| Collection: KLMGK | Publisher: মীর রহমান |
| Title: চতুরঙ্গ | Size: 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m. |
| Vol. & Number: ৫১/১<br>৫১/2<br>৫১/৩<br>৫১/8 | Year of Publication: বৈশাখ ১৩৯৭ ॥ May 1990<br>জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ ॥ Jun 1990<br>আষাঢ় ১৩৯৭ ॥ July 1990<br>শ্রাবণ ১৩৯৭ ॥ Aug 1990 |
| | Condition: Brittle / Good ✓ |
| Editor: আবদুর রউফ | Remarks: |

C.D. Roll No.: KLMGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

# চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫১ সংখ্যা ৪ অগস্ট ১৯৯০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৪৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ভারতের দুই মহাকাব্যে কালবিভাজনে কলি'র যুগধর্ম হিসাবে যা নির্ধারিত বাস্তব কি এখন তাই ? এই কলিযুগ-কল্পনার মূলে ক্রিয়া করেছে কাদের আধিপত্যবাদী মনোভাব ? অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ ।

"মহাভারত কথা"র শেষ অংশে থাকছে
মহাকাব্যে বর্ণিত বিচিত্র মানুষদের নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক পরিচয় নির্ধারণের প্রয়াস ।

কলকাতা তিনশোয় যারা অনালোচিত, সেইসব চাকর-বাকর, ঝাড়ুদার, ঠেলাওয়ালা, রিকশাওয়ালা,
মজুর-শিশুমজুরদের আবহমান
জীবনসংগ্রামের তথ্যসমৃদ্ধ আলেখ্য "অভাগার স্বর্গ"
লিখেছেন অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত ।

**সি পি এস ইউর** জামানায় গোরবাচেভ-পর্বে কি আবার এসেছে—"নতুন বসন্ত" ? ড· সুনীল সেনের বিশ্লেষণ ।

দারিদ্র্য নামক আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের সূত্র সন্ধানে প্রয়াত অর্থনীতিবিদ ড· সুধীর সেনের সুদীর্ঘ অন্বেষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।

ষাটবছরের প্রাচীন অনন্য সাহিত্য-মজলিশ "রবিবাসর" নিয়ে আলোচনা ।

বিপুল সামরিক খরচের রাহুগ্রাস থেকে রেহাই পাবার পন্থা নির্দেশে প্রয়াসী হয়েছেন শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বাউল-ফকির নির্যাতনের ধর্মীয় জিগিরের আড়ালে ভিন্ন অভিপ্রায়কে চিহ্নিত করেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ।

বাঙলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা নিয়ে একটি তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থের আলোচনা ।

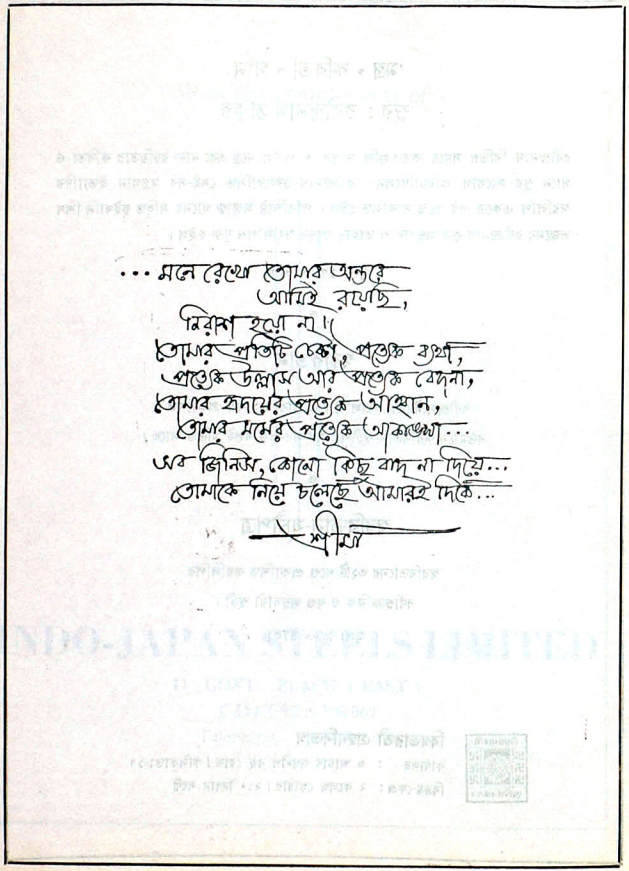

… মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা…
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে…
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে…

— শ্রীমা

বর্ষ ৫১। সংখ্যা ৪
অগস্ট ১৯৯০
শ্রাবণ ১৩৯৭

মহাকাব্যে যুগধর্ম জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫১
মহাভারতকথা অরুণা হালদার ২৬২
কমিউনিস্ট দুনিয়ার আলোড়ন সুনীল সেন ২৯০
অভাগার স্বর্গ চিত্তব্রত পালিত ২৯৪

সময়ের বাইরে সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ২৭৩
স্বভাবজ কিরণশঙ্কর মৈত্র ২৭৫
চৌরঙ্গি থেকে ব্রাডফোর্ড জয়শ্রী গুপ্ত ২৭৬
জন্ম রফিক উল ইসলাম ২৭৭

সোনালি ডানার চিল কৌন্তেয় গঙ্গোপাধ্যায় ২৭৮

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ২০৬
রবিবাসর হরপ্রসাদ মিত্র

গ্রন্থসমালোচনা ৩১০
সুরজিৎ ঘোষ, খাজিম আহমেদ, সুজিৎ ঘোষ

মতামত ৩২৪
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

*WITH BEST COMPLIMENTS*

"TO BUILD A BETTER TO-MORROW D. T. M. OFFERS
A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND
MANUFACTURING SERVICES UNDER ONE ROOF"

**SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—**

- ☐ MATERIAL HANDLING PLANT
- ☐ LPG BOTTLING PLANTS
- ☐ 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- ☐ MULTISTORIED BUILDING
- ☐ HOUSING COMPLEXES
- ☐ BRIDGE & ROADS
- ☐ FACTORY BUILDING & SHEDS
- ☐ GAS TURBINE PROJECTS
- ☐ MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- ☐ DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- ☐ HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION
- ☐ AND GOVERNMENT PROJECTS

**D. T. M. CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED**

*CIVIL ENGINEER, CONTRACTORS AND MASTER DREDGERER*

*City Office :*
**59B CHOWRINGHEE ROAD**
**( 5th Floor )**
**CALCUTTA-700 020**
Phone : 43-3165, 43-3093
Telex : 021-5294 ANIP IN

*Registered Office :*
**1, MANGOE LANE**
**( 2nd Floor )**
**CALCUTTA-700 001**
Phone : 20-0194
Cable : COLBEAM

25 YEARS' DEDICATED SERVICE TO THE NATION

# মহাকাব্যে যুগধর্ম

**জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়**

ইতিহাসচেতনা বলতে বর্তমান কালে যা বোঝায়, প্রাচীন ভারতে তা ছিল প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ইতিহাসচিন্তার বিকল্প হিসেবে যা গড়ে উঠেছিল তা হল দার্শনিক এবং ধর্মীয় অবয়বে মহাকালচিন্তা।[১] জাগতিক পরিসরে এই মহাকালচিন্তা পরিণত হয়েছিল যুগবিভাগ এবং যুগধর্মের তত্ত্বে। বহু সহস্র বৎসর বিস্তৃত যুগরূপী কাল্পনিক বিরাট খণ্ডকালের চক্রাকারে পরিবর্তনের মাধ্যমে ধর্মের উত্থানপতনকল্পনাই ছিল এই যুগচিন্তার মূলাধার। এই যুগ-ধর্মতত্ত্ব ছিল প্রাচীন মহাকাব্য এবং পুরাণের এক প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। আর এই তত্ত্বে বিশ্বাস প্রাচীন এবং মধ্য যুগের ভারতবর্ষের চিন্তক এবং জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বর্তমান কালেও ধর্মনায়কেরা এই যুগ-ধর্মের তত্ত্বকে এদেশে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য আঙ্গিক হিসেবে প্রচার করে থাকেন, এবং জনসাধারণের এক বড়ো অংশ এই তত্ত্বকে ধ্রুব সত্য বলে বিশ্বাস করেন। দূরদর্শনে রামায়ণ এবং মহাভারত প্রতি পর্বে যেরকম ভূমিকা, উপসংহার, এবং আঙ্গিক সহযোগে দেখানো হচ্ছে, তার ফলে জনমনে যুগধর্ম এবং যুগাবতারের তত্ত্বে বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছে। এই যুগতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, সৃষ্টির প্রথমে সত্যযুগে ধর্ম বিশুদ্ধ রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। তারপর ত্রেতা আর দ্বাপর যুগে পর্যায়ক্রমে ধর্মের অবনতি হতে থাকে। শেষে কলিযুগে ধর্মের চূড়ান্ত অধঃপতন ঘটে। তারপর অধর্মের অবসান হয়ে আবার বিশুদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং নূতন করে সত্যযুগ আরম্ভ হয়। আর, যুগে-যুগে দুষ্কৃতদের বিনাশ এবং সাধুদের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভগবানের অবতার আবির্ভূত হন। ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান এবং মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যুগধর্মতত্ত্বের পর্যালোচনাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন যুগের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে মহাকাব্য এবং পুরাণে কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ব পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ, মহাভারত বলছে, সত্যযুগের পরিমাণ চার হাজার বৎসর। তার সন্ধ্যা চার শত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও চার শত বৎসর। ত্রেতাযুগের দৈর্ঘ্য তিন হাজার বৎসর, তার সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ প্রতিটি তিন শত বৎসর। দ্বাপর যুগ দুই হাজার বৎসর, তার সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ প্রতিটি দুই শত বৎসর। কলিযুগ এক হাজার বৎসর, আর তার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রতিটি এক শত বৎসর। মোট যুগচক্রের পরিমাপ বারো হাজার বৎসর। মহাভারত আরও বলছে যে, মানুষের সহস্র যুগ ব্রহ্মার এক যুগের সমান। কিন্তু মহাভারত কোথাও বলে নি যে পৃথিবীতে

যুগের পরিমাণ মানুষী হিসেবে নয়, ব্রাহ্মী হিসেবে।[২] এদিকে বিষ্ণুপুরাণ বলছে যে, মানুষের দু হাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিনরাত হয়, মানুষের এক বছরে দেবতাদের এক দিনরাত হয়, আর দেবতাদের বারো হাজার বছরে পৃথিবীতে চার যুগ হয়।[৩] বলা বাহুল্য, বিষ্ণুপুরাণের হিসেব অনুযায়ী দেবতার মাপে প্রতি যুগের পরিমাণ মহাভারতের পরিমাণের চেয়ে তিনশ পঁয়ষট্টি গুণ বেড়ে যাবে। আর ব্রহ্মার হিসেবে যুগের পরিমাপ করা মানুষের পক্ষে প্রায় অসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে।

বিভিন্ন যুগের দৈর্ঘ্য যাই হোক না কেন, মূল বিশ্বাস এই যে বিশুদ্ধ ধর্মের আধার সত্যযুগই দীর্ঘতম যুগ। আর তারপর ধর্মের হ্রাস এবং অধর্মের বৃদ্ধির অনুপাতে যুগের স্থায়িত্ব ক্রমশ ছোটো হয়ে আসে। ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ কল্পনা এই যে ধর্ম ও অধর্মের সঙ্গে, অতএব যুগপরিবর্তনের সঙ্গে, জাতিবর্ণভেদের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। এ বিষয়ে রামায়ণ বলছে : 'এই সত্যযুগে তপস্যার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব, ব্রাহ্মণেরা সর্বপ্রধান এবং লোকসকল অজ্ঞানতার আবরণশূন্য। অকালমৃত্যু কাহাকেও স্পর্শ করিত না, এবং সকলেই দীর্ঘদর্শী ছিল। সত্যের পর ত্রেতাযুগ। এই সময়ে মনুষ্যের ব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি শিথিল হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন দেহে আত্মাভিমান এবং ক্ষত্রিয়ের জন্ম।' প্রাচীন ভারতে এক সময়ে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের মধ্যে আধিপত্যের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। এই সময়কেই ত্রেতাযুগ রূপে চিহ্নিত করে রামায়ণ বলছে : 'মন্বাদি ঋষিগণ এই যুগে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষত্রিয় অপেক্ষা কিছু বিশেষত্ব না দেখিয়া চাতুর্বণ্যের সম্মত মর্যাদাস্থাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন।···এই অবস্থায় চতুষ্পাদ অধর্ম পাদমাত্রে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়।' রামায়ণের মতে, ক্ষত্রিয়দের আবির্ভাব ছাড়াও ত্রেতাযুগে অধর্মের আরেকটি প্রধান কারণ কৃষিকার্যের প্রচলন। 'অধর্মের এই কৃষিরূপ একপাদে পৃথিবীতে অবস্থান নিবন্ধন লোকের আয়ু সত্যযুগ অপেক্ষা হ্রাস হইয়া আইসে।' তপস্যায় অধিকারের সঙ্গে বর্ণভেদের সম্পর্ক বর্ণনা করে রামায়ণ বলছে : 'ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তপস্যায় অধিকার ; অপর বর্ণ উহাদেরই শুশ্রূষাপর ছিল। এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শুশ্রূষারূপ স্বধর্ম বৈশ্য ও শূদ্রকে অধিকার করে। কিন্তু বৈশ্য কৃষিপ্রবৃত্ত হওয়াতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের, এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই সেবা করিত। অতঃপর ত্রেতাযুগে অমৃতরূপ ( কৃষি ) অধর্মের পাদ বৈশ্য ও শূদ্রকে অধিকার করিলে পূর্ববর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভাব খর্ব হইয়া যায়।' রামায়ণের মতে, দ্বাপরযুগে কৃষিকার্য ছাড়াও মানুষের মধ্যে সাম্যের মূল্যবোধ জাগ্রত হয়, এবং অধর্মের এটাও ছিল একটা বড়ো লক্ষণ। 'এই সময় অধর্ম সমতারূপ দ্বিতীয় পাদ পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে এবং দ্বাপরযুগেই উৎপত্তি হয়। এই দ্বাপরযুগে অধর্ম ও অমৃত ( কৃষি ) বর্ধিত হইয়াছিল। ফলতঃ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে তপস্যা ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণকে আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু এই তিন যুগে শূদ্রের তাহাতে অধিকার হয় নাই। এই নীচ বর্ণ ভবিষ্যতে ঘোরতর তপস্যা করিবে। কলিযুগই তাহার প্রকৃত সময়।'[৪]

মহাভারতের আদিপর্বে বলা হয়েছে যে সত্যযুগেও ক্ষত্রিয় ছিল, কৃষিকার্যের প্রচলন ছিল, বৈশ্য এবং শূদ্র শ্রেণীও বর্তমান ছিল। কিন্তু এ যুগে ধর্মের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে রামায়ণ এবং মহাভারতের বক্তব্য মোটামুটি এক। সত্যযুগ সম্বন্ধে আদিপর্ব বলছে : 'তৎকালে লোকের অকালমৃত্যু হইত না বা যৌবনকাল আগত না হইলে কেহ দারপরিগ্রহ করিত না। এইরূপে সসাগরা ধরা দীর্ঘজীবী প্রজাপুঞ্জে পরিপূর্ণ হইল। সেই সময়ে ক্ষত্রিয়েরা প্রচুর ধনদানপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। ব্রাহ্মণগণ বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা কদাচ বেদ বিক্রয় বা শূদ্রসন্নিধানে বেদোচ্চারণ করিতেন না। বৈশ্যেরা বলবান বলীবর্দ দ্বারাই কৃষিকর্ম করিত, দুর্বল গোসকলকে ভারবহনকার্যে নিযুক্ত না করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিত। ফেনপায়ী বৎস সত্ত্বে কেহ গোদোহন করিত না। বণিকেরা কূট পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিত না। সকল লোকেই ধর্মপরায়ণ ও সদাচারতৎপর ছিল। তৎকালে ধর্মের কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই। নারীগণ এবং ধেনুগণ যথাকালে সন্তান প্রসব করিত। তরুমণ্ডলী যথাসময়ে ফলপুষ্পে পরিপূর্ণ হইত। সত্যযুগে পৃথিবী এইরূপ বহুসংখ্যক লোকে সমাকীর্ণ হয়।'[৫] এদিকে বনপর্বে হনুমান ভীমকে আবার সত্যযুগের অন্যরকম বর্ণনা দিচ্ছেন। হনুমান বলছেন : 'তৎকালে···ক্রয়বিক্রয়ের সম্পর্ক ছিল না। সাম, ঋক্ এবং যজুর্বেদানুসারে ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ হইত না। কৃষি প্রভৃতি মানুষী ক্রিয়াসকল বিলুপ্ত হইয়াছিল। লোকেরা সংকল্পানুসারে সমস্ত ফলসম্পন্ন হইত এবং সন্ন্যাসই পরম ধর্ম ছিল।'[৬] বনপর্বে হনুমানের বক্তব্যে দ্বাপর এবং কলিযুগে বিভিন্ন বর্ণের অভ্যুত্থানের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমান্বয়ে ধর্মের অবনতির কথা বলা হয়েছে। আর বনপর্বেই মার্কণ্ডেয় ঋষির মুখে কলিযুগে শূদ্রের আধিপত্যস্বরূপ ঘোর অধর্মের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

ধর্ম এবং অধর্মের উত্থানপতনের সঙ্গে জাতিবর্ণের আবির্ভাব এবং তুলনামূলক আধিপত্যের যে সম্পর্ক রামায়ণ, মহাভারত এবং আঠারোটি পুরাণে কল্পনা করা হয়েছে, তার ঐতিহাসিক ও আর্থসামাজিক কারণ আছে। প্রথমত, বহিরাগত আর্যরা প্রাথমিক পর্যায়ে যাযাবর জাতি হিসাবেই এদেশে এসেছিল, এবং এদেশের পরাজিত মানুষদের প্রায় সবাইকেই হীনতার পরিচায়ক "দাস" আখ্যা দিয়েছিল। তারা যুদ্ধবিগ্রহ এবং যাগযজ্ঞে অভ্যস্ত ছিল বলে তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দেরই আধিপত্য ছিল। পরে স্থায়িভাবে কৃষিকার্য এবং বাণিজ্য আরম্ভ হলে এসব পেশাকে ব্রাহ্মণেরা নিকৃষ্ট এবং অধর্মের পরিচায়ক বলে চিহ্নিত করলেন। কারণ এখানে যাগযজ্ঞের প্রাধান্য ছিল না, এবং প্রাথমিক পর্যায়ে সম্ভবত ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় যুগের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত উত্তরভারতে বহুসংখ্যক বহিরাক্রমণ হয়, এবং গ্রীক, পারসিক, শক, কুশান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি এদেশে ঢুকে পড়ে বসতি স্থাপন করে। ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্র-শাসিত সমাজের রীতিনীতির প্রতি এদের আনুগত্য ছিল না বলে এদের সাধারণত শূদ্র, ম্লেচ্ছ এবং অধার্মিক বলে ঘোষণা করা হত। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনায় এবং কর্ণপর্বে কর্ণ এবং শল্যের বাদানুবাদে এই সামাজিক চিত্র পরিস্ফুট। তৃতীয়ত, ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র এবং মহাকাব্য রচনার যুগ ভারতবর্ষে একই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান এবং প্রসারেরও যুগ। বৌদ্ধধর্ম সামাজিক সাম্যের আদর্শে বিশ্বাসী এবং জাতিবর্ণভেদের প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে একদিকে ধর্মশাস্ত্রগুলির মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুশাসন কঠোরভাবে বলবৎ করবার চেষ্টা করা হয় ; আরেক দিকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের অধার্মিক আর শূদ্রতুল্য গণ্য করা হতে থাকে। চতুর্থত, খ্রীষ্টপূর্ব কয়েকশ বছর এবং খ্রীষ্টপরবর্তী দু-তিনশ বছরে পেশাগত এবং সামাজিক স্থানাঙ্কের নিরিখে বৈশ্য এবং শূদ্রদের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ কমে আসে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নামক মুষ্টিমেয় পরগাছা শ্রেণী বাদে উৎপাদনশীল সমস্ত জনসাধারণই কার্যত শূদ্র হিসেবে গণ্য হয়। আর ধর্মশাস্ত্রের মাধ্যমে ক্রমশ শূদ্র ও বৈশ্যদের প্রতি অর্থাৎ জনসাধারণের বিপুল গরিষ্ঠ অংশের প্রতি, একই ধরনের বৈষম্য- এবং নির্যাতন-মূলক অনুশাসন চালু করা হয়।[৭]

এদিকে প্রাচীন ভারতে সমগ্র জনসাধারণ খুব ধর্মপ্রাণ ছিলেন, এবং পারলৌকিক কল্যাণের আকাঙ্ক্ষায় ইহলোকে ধর্মশাস্ত্রীয় নির্যাতন মেনে নিয়েছিলেন, একথা মনে করবার কোনো সংগত কারণ

নেই। সর্বকালের মতো প্রাচীন কালেও লোকের জাগতিক বিষয়বাসনা প্রবল ছিল, এবং সব শ্রেণীর লোকেরাই জাগতিক উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করতেন, এটাই স্বাভাবিক। বার্হস্পত্য কিংবা চার্বাক দর্শনের মধ্যে জনসাধারণের এই অধার্মিকতা প্রতিফলিত হয়েছিল, এবং এই জাগতিক দর্শনের বিপুল জনপ্রিয়তাবশতই একে লোকায়ত দর্শন বলা হত। রামায়ণে জাবালি চরিত্রে এবং মহাভারতে চার্বাক চরিত্রে এই লোকায়ত দর্শনের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে, এবং ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতি তাদের অনীহা, এমনকী উদ্ধত আচরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর অর্থ না থাকলে শুধু ধর্ম দিয়ে যে মানুষের কোনো কাজ হয় না, এবং ধর্মীয় অনুশাসনের ভিতই নড়বড়ে হয়ে যায়, একথা ব্রাহ্মণেরা ভালোভাবেই জানতেন। ক্ষত্রিয়েরা তো সবচেয়ে ভালো জানতেন। লঙ্কাযুদ্ধের এক করুণ মুহূর্তে লক্ষ্মণের আক্ষেপ এ-প্রসঙ্গে মনে রাখবার মতো: 'যেমন পর্বত হইতে নদী নিঃসৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ দিগ্‌দিগন্ত হইতে আহৃত প্রবুদ্ধ অর্থ হইতে সমস্ত ধর্মক্রিয়া প্রবর্তিত হয়। অর্থহীন অপ্রাপ্য পুরুষের সমস্ত কার্য গ্রীষ্মকালে স্বল্পতোয়া নদীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অর্থ ব্যতীত সুখ কামনা করে সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং তন্নিবন্ধন দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফলত অর্থই পুরুষার্থ, যাহার অর্থ তাহারই মিত্র, যাহার অর্থ তাহারই বান্ধব, সেই সর্বাপেক্ষা গুণী।··· যাহার অর্থ তাহারই ধর্মকামে প্রয়োজন, তাহার সমস্তই অনুকূল।···হর্ষ, কাম, দর্প, ধর্ম, ক্রোধ, শান্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এই সমস্তই অর্থের আয়ত্ত।'[৮] একই ধরনের কথা দ্রৌপদী এবং ভীম বনপর্বে বারবার বলেছেন। পঞ্চতন্ত্র এবং অন্যান্য নীতিশাস্ত্রেও এই তত্ত্ব বারবার প্রচার করা হয়েছে।

একদিকে বহুসংখ্যক বহিরাগত মানুষের ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রতি অনীহা, আর অন্যদিকে বৈশ্য ও শূদ্রদের সংখ্যাবৃদ্ধি, অধার্মিকতা এবং ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্য ধর্ম-শাস্ত্র- এবং মহাকাব্য-রচয়িতাদের মনে এই ধারণাই সৃষ্টি করেছিল যে ইতিহাসে ক্রমশ ধর্মের অধঃপতন আর অধর্মের অভ্যুত্থান হচ্ছে। এক সময়ে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের মধ্যে পারস্পরিক আধিপত্য নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র এবং পরশুরামের উপাখ্যান প্রভৃতির মাধ্যমে এই দ্বন্দ্ব রূপ পেয়েছে। কালক্রমে পারস্পরিক স্বার্থে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের দৈব উৎপত্তি এবং সীমাহীন জাগতিক সার্বভৌমতা স্বীকার করে নেন, আর ক্ষত্রিয়েরা ধর্মীয় ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অনুশাসন প্রণয়নের অধিকার মেনে নেন। কাল্পনিক ত্রেতা যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সমতার এই তাৎপর্য। কিন্তু অগণিত শোষিত মানুষকে দাবিয়ে রাখবার জন্যে বৈশ্যশূদ্রদের হীনত্ব প্রতিপন্ন করবার প্রয়োজন ছিল। আর এ কারণেই তাদের সংখ্যা- ও প্রভাব-বৃদ্ধির সমানুপাতে অধর্মবৃদ্ধির তত্ত্ব রচিত হয়েছিল। রাম-কর্তৃক তপস্যারত শূদ্র শম্বুকের নৃশংস হত্যা এই তত্ত্বকে ভয়াবহ এবং প্রতিশোধক উদাহরণের মাধ্যমে জনমনে প্রোথিত করবারই প্রতীকী প্রয়াস মাত্র। বৈশ্য এবং শূদ্রদের সংখ্যা-বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান আর্থসামাজিক গুরুত্ব দ্বাপর এবং কলিযুগের অধার্মিকতার তত্ত্বের রূপ পেয়েছে। আর বৈশ্য এবং শূদ্রদের মধ্যে আর্থসামাজিক দূরত্ব হ্রাস, এবং ক্ষমতার লড়াইয়ে তাদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব রূপ পেয়েছে দ্বাপর এবং কলি যুগের অধার্মিকতার তত্ত্বে। অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র- এবং মহাকাব্য-রচয়িতারা সমকালীন আর্থসামাজিক কাঠামোর গতি এবং প্রকৃতি নিরীক্ষণ করেই যুগধর্মের তত্ত্ব রচনা করেছিলেন।

মহাকাব্য এবং পুরাণের বক্তব্য অনুযায়ী সত্যযুগ আরম্ভ হবার আগে মহাপ্রলয়ের সময় বিষ্ণু মীন-অবতার রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সত্যযুগ যদিও পরিপূর্ণ ধর্মের যুগ বলে কথিত, তথাপি তখনও বিষ্ণুর বরাহ-অবতার আবির্ভূত হয়েছিলেন, জনসংখ্যায় ভারাক্রান্ত শূন্যমার্গে পতনশীল পৃথিবীকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিতে। কূর্ম-অবতার আবির্ভূত হয়েছিলেন সমুদ্রমন্থনের সময় মন্দরপর্বতের ভার বহন করতে। আর নৃসিংহ-অবতার এসেছিলেন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করতে। কিন্তু সবশুদ্ধ পৃথিবীতে অধর্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল না বলে সত্যযুগের শেষে ত্রেতাযুগ প্রবর্তন করবার জন্যে বিষ্ণুর কোনো অবতারের প্রয়োজন হয় নি। ত্রেতা-যুগে যদিও অধর্ম তত প্রবল ছিল না, তথাপি কোনো-কোনো পুরাণ লোকবিশ্বাস অনুযায়ী ত্রেতা-যুগের সন্ধ্যায়ই বিষ্ণুর অবতার রূপে রামচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছিল। আর দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণ অবতারের নেতৃত্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর কলিযুগ আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে, বিশেষত শম্বুকবধের উপাখ্যানে, স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, রামরাজ্য তথাকথিত দ্বাপরযুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তা ছাড়া, বিশেষজ্ঞেরা এ বিষয়ে একমত যে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী সমকালেই রচিত হয়েছিল, যদিও মহাভারত রচনা আরম্ভ হয় রামায়ণের আগে এবং শেষ হয় রামায়ণের পরে। একথা মনে করবার কোনো সংগত কারণ নেই যে রামায়ণের কাহিনী মহাভারতের কাহিনীর বহুসহস্র বৎসর আগেকার কোনো ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে রচিত। প্রকৃতপক্ষে উভয় মহাকাব্যই সমকালীন কবিকল্পনা মাত্র নয়।[৯] যাই হোক, মহাকাব্য, পুরাণ এবং লোকবিশ্বাস অনুযায়ী কলিযুগই যুগচক্রের শেষ যুগ, এবং এই যুগের সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণ কল্কি-অবতার আবির্ভূত হয়ে শূদ্র ও ম্লেচ্ছদের ধ্বংস করে ব্রাহ্মণদের হাতে পৃথিবীর শাসনভার অর্পণ করবেন। আর এভাবেই সত্যযুগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, এবং নূতন যুগচক্র আরম্ভ হবে। প্রকৃতপক্ষে কলিযুগে অধর্মের বর্ণনা এবং কল্কি-অবতারের ভূমিকার বিশ্লেষণ করলেই মহাকাব্য- এবং ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতাদের মানসিকতা এবং উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। যুগধর্ম-প্রণেতাদের মতে আমরা বর্তমানে কলিযুগেই বাস করছি, এবং পৌরাণিক হিসেব যদি সত্য হয়, তবে কলিযুগের সন্ধ্যার আর বিশেষ বিলম্ব নেই।

## দুই

মহাভারতের বনপর্বে দুবার কলিযুগের অধর্ম এবং ভয়াবহতা বর্ণিত হয়েছে। একবার ভীম দ্রৌপদীর অনুরোধে পদ্ম আনতে যাবার পথে হনুমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় ভীমের প্রশ্নের উত্তরে "ত্রিকালজ্ঞ" হনুমান বিভিন্ন যুগের বর্ণনা দিতে গিয়ে কলিযুগের কথা কিছু বললেন। পরে আবার মার্কণ্ডেয় ঋষি পঞ্চপাণ্ডবকে সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে বিশেষ করে কলিযুগের চরিত্রই বোঝালেন, এবং কলির সন্ধ্যায় কল্কি-অবতার আবির্ভূত হয়ে কিভাবে আবার সত্য-যুগের প্রতিষ্ঠা করবেন, সে কথাও সবিস্তারে বললেন। তা ছাড়া, সব পুরাণেই কলিযুগের চরম অধর্ম এবং ভয়াবহতা সম্বন্ধে একই ধরনের বর্ণনা আছে। বিভিন্ন পুরাণের বর্ণনার মধ্যে কিছু-কিছু পার্থক্য থাকলেও মূল বক্তব্য মোটামুটি একই। এবং সম্ভবত পুরাণের বর্ণনাগুলি মূলত মহাভারত থেকেই নেয়া হয়েছে। অতএব প্রাচীন মহাকাব্য এবং পুরাণের মতে কলি-যুগের তাৎপর্য বুঝতে হলে মহাভারতের বনপর্বে মার্কণ্ডেয় ঋষির বিস্তারিত বিবরণকেই মূল উৎস হিসেবে ধরা বাঞ্ছনীয়।

মহাভারতে এবং পুরাণে কলিযুগকে ভবিষ্যতের অন্ধকারময় যুগ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। অতএব সমস্ত বর্ণনাই ভবিষ্যৎকথনের ভঙ্গিতে লেখা হয়েছে। এর ফলে একদিকে ঘটনাসূচক ভবিষ্যৎ-বাণীগুলি কতটা সত্যে পরিণত হয়েছে বা হতে চলেছে, তা সহজেই বিচার করা যেতে পারে। অন্য-দিকে সেসব ভবিষ্যদ্বাণী যে মূল্যবোধের সূচক, সে-গুলিকেও আধুনিক কালের মানবিক মূল্যবোধের নিরিখে পরীক্ষা করা সহজ।

কলিযুগে চূড়ান্ত অধর্মের সূচক যেসব ঘটনা

সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে, আগে তারই আলোচনা করা যেতে পারে। কলিযুগ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয় প্রথমে বললেন যে, সত্যযুগে ধর্ম চতুষ্পাদ অর্থাৎ পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল। তারপর ত্রেতাযুগে একপাদ এবং দ্বাপরে দ্বিপাদ অধর্ম পৃথিবীকে গ্রাস করে। কলিযুগে ত্রিপাদ অধর্ম এবং মাত্র একপাদ ধর্ম বর্তমান থাকবে। এই বক্তব্য রামায়ণেও আছে। মার্কণ্ডেয় বলেছেন, কলিযুগের অধর্মের অন্যতম লক্ষণ হবে মানুষের আয়ুঃক্ষয়। এ বিষয়ে তাঁর ভবিষ্যৎবাণী : পরমায়ুর পরিমাণ ষোড়শ বর্ষ হইবে, তৎপরই মানবগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। কন্যাগণ পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষে সন্তান প্রসব করিবে, পুরুষগণ সপ্তম বা অষ্টম বর্ষে অপত্যোৎপাদন করিবে।[১০] মহাভারতের অন্যত্র এবং বিভিন্ন পুরাণে এই হিসেবের সামান্য তারতম্য আছে, কিন্তু তা উল্লেখযোগ্য নয়। বলা বাহুল্য, এই অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্‌বাণী একেবারেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। গত কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষ সহ সারা পৃথিবীতেই মানুষের গড় আয়ু ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনের বয়সও ক্রমশ বাড়ছে। শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিই এর প্রধান কারণ। মানুষের আয়ুঃক্ষয় যদি অধর্মের ফল হয়, আর আয়ুর্বৃদ্ধি যদি হয় ধর্মবৃদ্ধির পরিমাণ, তবে মহাকাব্য এবং পুরাণের রচয়িতারা যাকে কলিযুগ বলে চিহ্নিত করেছেন, সে যুগে ধর্মের বৃদ্ধি এবং অধর্মের হ্রাস হচ্ছে বলেই মনে হয়। মার্কণ্ডেয় আরও বলছেন যে, এ ধরনের আয়ুঃক্ষয় এবং অকালমৃত্যুর ফলে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাবে। 'জনপদসমূহ শূন্যপ্রায় ও দিকসকল মৃগ ও হিংস্রজন্তুসমূহে পরিপূর্ণ হইবে।'[১১] বলা বাহুল্য, সারা পৃথিবীতে, বিশেষত ভারতবর্ষে, এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর বিপরীত পরিণতিই লক্ষ করা যাচ্ছে। আগেই আমরা লক্ষ করেছি যে, মহাকাব্য ও পুরাণের মত অনুযায়ী বিপুল জনসংখ্যায় পৃথিবী ভারাক্রান্ত হওয়া সত্যযুগেরই লক্ষণ, কলিযুগের নয়।

মহাভারতের মতে, কলিযুগে মানুষের বিদ্যা অনেক কমে যাবে। ফলে অজ্ঞানতা, হিংসা, দ্বেষ, সংঘাত প্রভৃতি বাড়বে। মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলছেন : 'কলিযুগে সত্যের হানি হইবে। সত্যের হানিতে আয়ুর অল্পতা। আয়ুর অল্পতাবশত সকলেই বিদ্যোপার্জনে অসমর্থ হইবে। বিদ্যার অদ্ধতা হইতে অজ্ঞান, অজ্ঞান হইতে লোভ, লোভ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ উৎপন্ন হইবে। তখন সমুদয় মনুষ্য লোভ, ক্রোধ, মোহ ও কামপরায়ণ এবং পরস্পর জিঘাংসাপরায়ণ হইয়া বৈরভাব উদ্ভাবন করিবে।'[১২] কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে এ যুগে মানুষের বিদ্যা যে সর্বক্ষেত্রেই প্রাচীন কালের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষত বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে, আর ফলস্বরূপ অজ্ঞানতার অন্ধকার অনেক পরিমাণে দূর হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সুস্থচিত্ত লোকেরই সন্দেহ থাকতে পারে না। আর রামায়ণ-মহাভারতের মূল কাহিনী এবং উপাখ্যানগুলি পড়লে একথা বিশ্বাস করবার কোনোই কারণ থাকে না যে সে যুগে লোভ, মোহ, ক্রোধ এবং জিঘাংসার প্রাবল্য বর্তমান কাল থেকে কিছুমাত্রও কম ছিল।

কলিযুগ সম্বন্ধে মহাভারতের আরেকটি ভবিষ্যদ্‌বাণী এই যে এ সময়ে দেবতারা ঠিক সময়ে বারি-বর্ষণ করবেন না, বীজ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্কুরের উদ্‌গম হবে না, গাছে যথেষ্ট ফল উৎপন্ন হবে না, গাভীরা কম দুগ্ধ দেবে। ফলে কৃষি-উৎপাদন কমে যাবে এবং লোকেরা অনাহারে অর্ধাহারে থাকবে। বৃষ্টি হলেও তা অসময়ে হবে। 'ভগবান সহস্রলোচন অনুচিত কালে বারিবর্ষণ করিবেন. শস্যরোপণ একেবারে রহিত হইয়া যাইবে।'[১৩] কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, একদিকে যেমন আয়ু এবং জনসংখ্যা কমে যাবার পরিবর্তে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে শস্য-উৎপাদন, পশুপালন, দুগ্ধ এবং দুগ্ধ-জাত দ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতিও পৃথিবীতে অনেক বৃদ্ধি







পেয়েছে। খাদ্যসমস্যা সম্পূর্ণ দূর না হলেও শস্য-উৎপাদন একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা সব মানুষের অনাহারে অর্ধাহারে থাকবার মতো কোনো অবস্থার সৃষ্টি হয় নি। আর দেবতাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করে মেঘ মনে হয় প্রাচীন কালেও যেভাবে বারিবর্ষণ করত, বর্তমান কালেও সেভাবেই করে থাকে। কখনও সময়ে, কখনও অসময়ে। বিশেষত ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য মৌসুমি অঞ্চলে।

প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতের কাল্পনিক কলিযুগকে চরম অধর্মের যুগ হিসেবে মহাকাব্যে এবং পুরাণে চিহ্নিত করবার মূল কারণ তৎকালীন ঐতিহাসিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেই নিহিত ছিল। ভারত-বর্ষের যে বিশেষ ঐতিহাসিক এবং আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে ধর্মশাস্ত্রগুলি রচিত হয়েছিল, সেই একই পরিস্থিতিতে এবং সময়ে রামায়ণ ও মহা-ভারতের মূল ক্ষত্রিয়কাহিনী দুটিকেও পল্লবিত করা হয়েছিল, প্রধানত ধর্মশাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের প্রয়োজনেই।[১৪] আর সে সময়েই বোঝা গিয়েছিল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ধর্ম-শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলিকে জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশের উপর পুরোপুরি চাপিয়ে দেয়া সহজ হবে না। বিশেষত, বহিরাগত বিভিন্ন জনসমষ্টি, বৌদ্ধধর্ম এবং জাগতিক লোকায়ত ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে। তাই ধর্মশাস্ত্রে যাদের বিশেষভাবে দমন করে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাদের, অর্থাৎ নারী আর শূদ্রদের, স্বাধীনতা এবং ঔদ্ধত্যকেই অধর্মের মূল পরি-চায়ক হিসেবে মহাভারতে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর সে সম্ভাব্য পরিস্থিতিকেই চূড়ান্ত অধর্মের প্রতীক কলিযুগ বলে কল্পনা করা হয়েছে।

নারীদের যে সম্পূর্ণ পরাধীনতা, এবং তাদের প্রতি যে অবিচার আর দমননীতি রামায়ণ ও মহাভারতের সর্বত্র প্রতিফলিত, আর তাদের সম্বন্ধে যে কুৎসা মহাভারতে, বিশেষত অনুশাসনপর্বে প্রচার করা হয়েছে, তারই বিস্তার কলিযুগের বিভীষিকার বর্ণনাতেও দেখতে পাওয়া যায়। কলিযুগে নারীদের আচরণ সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় বলেছেন : 'বিপরীতচারিণী রমণীগণ উপযুক্ত পতিদিগকে বঞ্চনা করিয়া দাস ও পশুদিগকে লইয়া আপনাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে। কি বীরপত্নীগণ, কি সামান্য মহিলাগণ সকলেই পতি বর্তমানেই পুরুষান্তর-সংসর্গ করিবে।'[১৫] আরও অশ্লীলতর এ-জাতীয় অনেক কথা মার্কণ্ডেয় কলিযুগের নারীদের সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্তু অনেক কথার মধ্যে যে মূল বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা এই যে, নারীরা আর সব ব্যাপারে পুরুষের সম্পূর্ণ অধীন না থেকে অনেক ব্যাপারেই স্বাধীন আচরণ করবে। 'কোনো ব্যক্তিই বিবাহার্থী হইয়া কন্যা প্রার্থনা করিবে না, এবং কেহ কন্যাদানও করিবে না। কন্যারা স্বয়ংগ্রহা হইবে।'[১৬] আবার 'কামিনীগণ লজ্জাপরিত্যাগ করিয়া নিজ স্বামীকে দ্বেষ করিবে।'[১৭] অথবা 'রমণীগণ পরুষবাদিনী, ক্রূরস্বভাব আর রোদন-প্রিয়া হইয়া কদাচ স্বামীর বশীভূত হইবে না।··· স্ত্রীলোক স্বতন্ত্র হইয়া পতি এবং পুত্রগণকে বিনষ্ট করিবে।'[১৮] অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্যে নারীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে শুধুমাত্র ভোগ্যদ্রব্য এবং দাসী হিসেবে ব্যবহার করবার যে সামাজিক আদর্শ সৃষ্টি করা হয়েছে, ভবিষ্যতে নারী সে অমানবিক আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজ স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টা করবে, মহাকাব্যের রচয়িতাদের এই ছিল মূল আশঙ্কা। আর এই আশঙ্কাকেই তাঁরা ভবিষ্যৎ কলিযুগের বিভীষিকা হিসেবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, নারীর ধর্মশাস্ত্রীয় দাসত্ব নয়, নারীমুক্তিই আধুনিক যুগের মানবিক মূল্যবোধের পরিপূরক আদর্শ। নারীর যে স্বাধীন সত্তাকে মহা-কাব্যের রচয়িতারা অধর্মের বিভীষিকা রূপে কল্পনা করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে ন্যায় এবং প্রগতিরই প্রতীক।

কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত তথা ধর্মশাস্ত্রগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল তৎকালীন সমাজের শ্রেণীচরিত্রের দিকে। আর তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব

এবং শূদ্রের হীনস্থান প্রতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত করা। এ প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের বহির্ভূত বহিরাগত, বনবাসী এবং পার্বত্য উপজাতি প্রভৃতিকেও অধার্মিক হিসেবে চিহ্নিত করা হত। বহিরাগতদের সাধারণত মেচ্ছ, যবন প্রভৃতি আখ্যা দেয়া হত, আর তাদের অভ্যুদয় আর ঔদ্ধত্যকে শূদ্রশক্তির অভ্যুদয় এবং ঔদ্ধত্যের সমতুল জ্ঞান করা হত। আর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ধর্মশাস্ত্র তথা মহাকাব্যের যুগে বৈশ্য এবং শূদ্রদের মধ্যে আর্থসামাজিক দূরত্ব কমে গিয়ে উভয় বর্ণই প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন শ্রম-বিভাজনের ভিত্তিতে একই শোষিত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। ধর্মশাস্ত্র- ও মহাকাব্য-প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল জনসংখ্যার বিপুল গরিষ্ঠ অংশ এই বৈশ্য-শূদ্র শ্রেণীকে আর্থসামাজিক পিরামিডের সুবৃহৎ ভিত্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত করে তার উপর মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শ্রেণীর পিরামিড-শিখর নির্মাণ করা। অর্থাৎ ম্লেচ্ছ, যবন, বনবাসী-পর্বতবাসী প্রমুখ তথাকথিত বর্বর জাতি, এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজের মধ্যে অবস্থিত বৈশ্যশূদ্র শ্রেণীসহ জনসাধারণের বিপুল গরিষ্ঠ অংশের সম্ভাব্য অভ্যুত্থানকেই ভবিষ্যৎ কলিযুগের অধর্ম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বনপর্বে মার্কণ্ডেয় ঋষির ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী কলিযুগে 'আন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, যবন, কাম্বোজ, বাহ্লীক, শূর ও আভীর প্রভৃতি বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতীয় ভূপতিগণ মিথ্যাবাদপরায়ণ ও পাপাসক্ত হইয়া মিথ্যা শাসন করিবে।'[১৯] ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহিরভূত এসব জাতি-উপজাতিদের প্রতি অধার্মিকতার অভিযোগ এবং কুৎসা প্রচার মহাভারতের অন্যত্রও আছে।[২০] কিন্তু এর চেয়েও ঘোর বিপদের কথা এই যে, ব্রাহ্মণ আর শূদ্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক ধর্মশাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিপরীত রূপ ধারণ করবে। 'ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদের ন্যায় আচরণ করিবে এবং শূদ্রগণ ধনোপার্জনপরায়ণ এবং ক্ষাত্রধর্মানুবর্তী হইবে।'[২১] অর্থাৎ শূদ্রেরা ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেদের জাগতিক পরিস্থিতি এবং আর্থসামাজিক অবস্থানের উন্নতির প্রয়াসী হবে। এমনকী উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। এই সম্ভাব্য সংঘাতে 'শূদ্রগণ জয়পরায়ণ হইবে। এইরূপে লোকমর্যাদা বিপরীত হওয়াই প্রলয়ের পূর্বলক্ষণ।'[২২] অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে শূদ্রশক্তির অভ্যুত্থান হবে, এবং জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশের সেই নবজাগরণই হবে অধর্ম এবং প্রলয়ের কারণ। এই পরিস্থিতিতে 'শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণকে "ভো" [ 'তুই' কিংবা 'এই ব্যাটা' ] বলিয়া সম্বোধন করিবে, ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগকে 'আর্য' বলিয়া সম্বোধন করিবে।'[২৩] অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী সনাতন পারস্পরিক সম্বোধনের ভাষা শূদ্রশক্তির অভ্যুত্থানের ফলে বিপরীত রূপ ধারণ করবে। কিন্তু শুধুমাত্র পারস্পরিক সম্বোধনের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন শ্রেণীদের মধ্যে এই বৈপরীত্যের শেষ হবে না। শূদ্রশক্তির অভ্যুত্থান প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের আকার ধারণ করবে। 'শূদ্রগণ ব্রহ্মহত্যা ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিবে। দ্বিজগণ শূদ্র-কর্তৃক পীড়িত হইয়া ভয়ব্যাকুলতায় হাহাকারপূর্বক অশরণ হইয়া ধরাতল পর্যটন করিবে। দ্বিজগণ···শূদ্রগণের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইয়া অকর্তব্য কর্মসকল সম্পাদন করিবে। শূদ্রগণ ধর্মোপদেশ প্রদান করিবে, ব্রাহ্মণগণ শিষ্য হইয়া প্রামাণ্যবুদ্ধি সহকারে তাহার শ্রোতা হইবে। নীচ উচ্চ এবং উচ্চ নীচ হইবে, এইরূপে সকলই বিপরীত হইবে।'[২৪] মহাকাব্য- ও ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতাদের কাছে আরো বিপদের কথা এই যে, 'সমুদয় জগৎ ম্লেচ্ছ হইয়া উঠিবে', খাদ্যাখাদ্যের কোনো বাছবিচার থাকবে না, এবং সকলেই এক রকম আহার করবে।[২৫] অর্থাৎ ধর্মাধর্ম এবং খাদ্যাখাদ্যের ধর্মশাস্ত্রীয় অনুশাসন আর কেউ মানবে না। ধর্মশাস্ত্রকারদের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো বিপদের কথা এই যে, 'সমুদয় লোক একবর্ণ হইবে।'[২৬] অর্থাৎ কলিযুগ নামে অভিহিত অনাগত ভবিষ্যতে শ্রেণীভেদ-বর্ণভেদ বিলুপ্ত হবে।

ঘোর অধর্মের যুগ এবং যুগচক্রের শেষ যুগ হিসেবে চিহ্নিত এই ভবিষ্যৎ কলিযুগের অবসান কিভাবে হবে তা নিয়ে মহাভারতে এবং বিভিন্ন পুরাণে বড়ো রকমের বিভ্রান্তি আছে। একদিকে দেখা যাচ্ছে অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস হবে। 'তৎপরে এককালে সপ্তসূর্য সমুদিত হইয়া সমুদ্র ও নদীসকলের জল শোষণ করিবে। শুষ্কই হউক বা আর্দ্রই হউক, যে কিছু তৃণকাষ্ঠ পৃথিবীতে থাকিবে, তৎসমুদয় ভস্ম হইয়া যাইবে। অনন্তর সংবর্তক নামক বহ্নি বায়ুসহায় হইয়া আদিত্যোপশোষিত ভূমণ্ডল আক্রমণ করিবে এবং পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালতলে প্রবেশপূর্বক দেব, দানব ও যক্ষগণের ভয়োৎপাদন করিবে।···তৎপরে গজকুলসদৃশ, তড়িন্মালা-বিভূষিত অদ্ভুতদর্শন মেঘসকল নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইবে।··· মুষলধারে বারিবর্ষণপূর্বক পর্বত ও কানন সমেত সমুদয় মেদিনীমণ্ডল প্লাবিত ও সেই ঘোরতর অশিব সংবর্তক হুতাশন নির্বাপিত করিবে।···এইরূপে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অবিচ্ছেদ্য বৃষ্টিধারা পতিত হইলে পর সমুদ্রজল বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া যাইবে। পরে সেই সমুদয় বারিধর প্রবল বায়ুবেগে আহত হইয়া চতুর্দিকে ভ্রমণপূর্বক সহসা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তখন কমলালয় আদিদেব স্বয়ম্ভু আকাশসংকোচ করিয়া সেই সকল প্রবল পবন পান করিয়া নিদ্রাগত হইবেন।'[২৭] তারপর আবার নূতন করে সৃষ্টি আরম্ভ হবে এবং সত্যযুগ থেকে নূতন যুগ-চক্রের সূত্রপাত হবে।

কিন্তু মহাভারতেরই অন্যত্র আবার বলা হয়েছে যে অধার্মিকদের ধ্বংস এবং ধার্মিকদের রক্ষার উদ্দেশ্যে নূতন অবতারের আবির্ভাব হবে। মহাভারত ছাড়াও এই তত্ত্ব রামায়ণ, গীতা এবং বিভিন্ন পুরাণের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। মহাভারতের বনপর্বে মার্কণ্ডেয় বলছেন: 'কালক্রমে সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবেন। মহাবীর্য মহানুভব কল্কি সেই ব্রাহ্মণগৃহে জন্মপরিগ্রহ করিবেন। তাঁহার নামমাত্রেই সমুদয় বাহন, কবচ, বিবিধ আয়ুধ ও ভূরি-ভূরি যোদ্ধা উপস্থিত হইবে।' এই কল্কি অবতার 'ব্রাহ্মণগণ পরিবৃত হইয়া' সর্বত্র ম্লেচ্ছদের ধ্বংস করবেন। আর শূদ্র ও ম্লেচ্ছসহ সমস্ত অধার্মিকেরা 'হা তাত! হা মাত! হা পুত্র!' বলে করুণ স্বরে ক্রন্দন করতে-করতে কল্কি-অবতারের 'করাল করবালের বলিস্বরূপ হইবে।' তারপর কল্কি-অবতার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে 'মেদিনীমণ্ডল ব্রাহ্মণ হস্তে সমর্পণ' করবেন, এবং এভাবেই সত্যযুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে।[২৮]

বলা বাহুল্য, একদিকে প্রাকৃতিক মহাপ্রলয় এবং অন্যদিকে কল্কি-অবতারের আবির্ভাবের মাধ্যমে কলি-যুগের অবসান আর সত্যযুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কল্পনার মধ্যে বলিষ্ঠ পরস্পরবিরোধিতা বর্তমান। আর এই পরস্পরবিরোধিতার সম্ভাব্য সমাধান শুধু একভাবেই করা সম্ভব। প্রাকৃতিক প্রলয়ের মাধ্যমে, বিশেষত বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পৃথিবী ধ্বংস হবার যে প্রাচীন কাহিনী মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রচলিত ছিল, আদি মহাভারতে সম্ভবত শুধুমাত্র সে কাহিনীই স্থান পেয়েছিল। আর সে মহাভারতে সম্ভবত কলিযুগের কোনো উল্লেখ ছিল না। মহাকালের অমোঘ গতি সম্বন্ধে মূল রামায়ণ এবং মহাভারতের সর্বত্র যে দর্শন ছড়িয়ে আছে, তার সঙ্গেও এই সুপ্রাচীন কল্পনা সামঞ্জস্যহীন নয়। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের সময়ে যেমন রাম আর কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব এবং অবতারত্বের তত্ত্ব সৃষ্টি করা হয়েছিল, সম্ভবত সেভাবেই ভবিষ্যৎ কলিযুগের অধর্মের বর্ণনা এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে কল্কি-অবতারের আবির্ভাবের তত্ত্বও সৃষ্টি করা হয়েছিল। রাম আর কৃষ্ণের সঙ্গে কল্কি-অবতারের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে, পূর্বোক্ত দুই অবতার যেখানে ক্ষত্রিয়, ভবিষ্যতের কল্কি-অবতার সেখানে ব্রাহ্মণ, যিনি ধ্বংসলীলার শেষে ব্রাহ্মণদের হাতে পৃথিবীর শাসনভার সমর্পণ করবেন, ক্ষত্রিয়দের হাতে নয়। এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর মধ্যে দিয়ে

যে ক্ষত্রিয়দের দ্বারা প্রতিপালিত এবং নিয়ন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে মহাভারতের আদিপর্বের উপাখ্যান,অনুযায়ী ব্রাহ্মণ পরশুরাম-কর্তৃক একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হবার পর ব্রাহ্মণদের ঔরসে ক্ষত্রিয় নারীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমেই আগে একবার সত্যযুগ প্রবর্তিত হয়েছিল। যদিও এই উপাখ্যানে রামায়ণ-মহাভারতের অন্যত্র এবং পুরাণে বর্ণিত যুগবর্ণনা আর যুগপরম্পরার সঙ্গে সাদৃশ্য নেই। এই উপাখ্যানেও ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলিত।

## তিন

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মহাকাব্যে কল্পিত যুগচক্রের তত্ত্ব শুধু যে প্রাচীন শ্রমবিভাজনের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণভেদের সমর্থনে রচিত হয়েছিল তাই নয়, বিভিন্ন বর্ণ বা প্রাচীন শ্রেণীর যে স্থানাঙ্ক এবং মর্যাদা সমকালীন আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত ছিল, তথাকথিত উচ্চবর্ণের স্বল্পসংখ্যক মানুষেরা ধর্মশাস্ত্র রচনার মাধ্যমে সে কাঠামোকেই চিরায়ত করতে চেয়েছিল। আর দুই মহাকাব্যের মূল ক্ষত্রিয়বাহিনীকে পল্লবিত করে তুলবার সময় একই উদ্দেশ্যে ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসনগুলিকে তাদের অঙ্গীভূত করা হয়। সেই সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রে নির্দিষ্ট নারীদের চিরপরাধীনতা এবং হীনস্থানকেও মহাকাব্যে ধর্মের অপরিহার্য আঙ্গিক রূপে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কলিযুগে শূদ্রশক্তির অভ্যুত্থান, তথাকথিত উচ্চবর্ণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে শূদ্রদের বিদ্রোহ, সব বর্ণের মানুষের এক বর্ণে রূপান্তর, আর নারীদের স্পর্ধা আর স্বাধীনতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রীয় অনুশাসনের প্রতিকূল সম্ভাবনা তাই চরম অধর্মের পরিচায়ক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ব্রাহ্মণ্য সংযোজন-পল্লবিত দুই মহাকাব্যে। অর্থাৎ যেসব সমকালীন রাজনীতি এবং প্রবণতা ধর্মশাস্ত্রবিরোধী বলে গণ্য হত, অথচ দূর করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেসবকেই মহাকাব্যে অধর্ম আখ্যা দেয়া হয়েছে, আর তাদের সম্ভাব্য বৃদ্ধির কালকেই ভবিষ্যতের ধর্মহীন কলিযুগ বলে কল্পনা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই শুধুমাত্র ধর্মশাস্ত্রের মাধ্যমে অসম আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিপূরক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুশাসনগুলিকে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা সম্ভব ছিল না। দুই মহাকাব্যের জনপ্রিয় ক্ষত্রিয়কাহিনীগুলিকে ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের মাধ্যমে পল্লবিত করে সে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করা হয়েছিল। এভাবেই কথকতা এবং লোকশ্রুতির পরম্পরায় প্রচলিত মহাকাব্যিক কাহিনীর মাধ্যমে অসম আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সমর্থনে রচিত ধর্মশাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলিকে জনমনের গভীরে প্রোথিত করা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু বলা বাহুল্য, শূদ্র এবং নারীশক্তির অভ্যুত্থান প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রীয় মূল্যবোধের প্রতিকূল হলেও আধুনিক মানবিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ অনুকূল এবং পরিপূরক। বস্তুত ব্যাপক অর্থে শূদ্র আর নারীশক্তির অভ্যুদয় পৃথিবীর ইতিহাসে প্রগতির প্রধান কারণ এবং পরিচায়ক। ভারতবর্ষে জনসাধারণের বিপুল গরিষ্ঠ এই দুই অংশের ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট সনাতন হীনস্থানই বহু শতাব্দী যাবৎ এদেশের গতিহীনতার প্রধান কারণ। বিশেষত, অবহেলিত ও নিপীড়িত শূদ্রশক্তি যে এদেশের প্রগতির পথে বিশেষ অন্তরায়, সে বিষয়ে কোনো মতপার্থক্যের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "অপমানিত" কবিতায় এই অমূল্য সত্যকেই তাঁর অনন্যকরণীয় কাব্যভঙ্গিময় প্রকাশ করেছেন। আর শূদ্রশক্তিই যে ইতিহাসের প্রধান চালিকা শক্তি, সেকথা শুধু মার্কস এবং মার্কসবাদীরা বলেন নি, ভিন্ন ভাষা এবং ছন্দে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। তাঁর "কালের যাত্রা" নাটকে মহাকালের রথ শূদ্রের করস্পর্শ না পাওয়া পর্যন্ত অচল থাকল।







ব্রাহ্মণদের মন্ত্রতন্ত্র এবং পুজোপার্বণ, ক্ষত্রিয়দের বীরত্বের আস্ফালন, আর বৈশ্যদের অর্থপাতে রথের রশি অনড় রইল। সবশেষে শূদ্রেরা এসে রথের রশিতে হাত লাগাতেই কালের রথ তথাকথিত উচ্চবর্ণদের বিস্ময় আর আতঙ্ক সৃষ্টি করে বিপুল গর্জনে এবং তীব্র গতিতে এগিয়ে চলল। অতএব যে প্রাচীন আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে ধর্মশাস্ত্রে এবং মহাকাব্যে সমর্থন জানানো হয়েছে, তা ছিল মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী, অন্যায়-অবিচার এবং অসত্যের উপর অধিষ্ঠিত। মহাকাব্যে যাকে আদর্শ ধর্ম হিসেবে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে, তা সেই অন্যায় আর অসত্যেরই প্রতীক। একই কারণে অবহেলিত আর নিপীড়িত মানুষের নবজাগরণ এবং অভ্যুদয়, যা নাকি মানবতার নিরিখে ইতিহাসে মৌলিক প্রগতির সূচক এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতীক, তা পল্লবিত মহাকাব্যের রচয়িতাদের কাছে ছিল চরম অধর্মের পরিচায়ক। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে মহাকাব্যরচয়িতারা অনাগত ইতিহাসের যে পর্যায়কে বিভীষিকাময় চরম অধর্মের কাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, কল্পিত সেই কলিযুগসন্ধ্যাই মানবিক মূল্যবোধের প্রকৃত সত্যযুগের প্রতিশ্রুতি বহন করছে।

### পাদটীকা

১। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, **ধর্ম ও প্রগতি**, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ ৬৩-৭২।

২। বেদব্যাসরচিত ও কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত **মহাভারত**, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৫, প্রথম খণ্ড, পৃ ৮২৪-২৫। এর পর থেকে পাদটীকায় এই সংস্করণকে **বেদব্যাসী মহাভারত** বলা হবে।

৩। **বিষ্ণুপুরাণ** (রবীন্দ্রনাথ কর্মকার অনূদিত), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ ৩০৭।

৪। বাল্মীকি রচিত ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত **রামায়ণ**, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ ১০৬২-৭০। এর পর থেকে পাদটীকায় এই সংস্করণকে **বাল্মীকি রামায়ণ** বলা হবে।

৫। **বেদব্যাসী মহাভারত**, প্রথম খণ্ড, পৃ ১২৪

৬। ওই, পৃ ৭২৯

৭। বিস্তারিত এবং প্রামাণ্য আলোচনার জন্য দেখুন, G. S Ghurye, *Caste and Race in India*, Kegan Paul, Landon, 1932, ch. III

৮। **বাল্মীকি রামায়ণ**, পৃ ৮৫৩-৫৫

৯। বিস্তারিত আলোচনার **জন্য** দেখুন, জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "কবি, তব মনোভূমি রামের জনমস্থান", **দেশ**, ৮ অক্টোবর, ১৯৮৮; "মহাভারত-দর্পণ", **প্রতিক্ষণ**, ১৭ মার্চ, ১৯৮৯

১০। **বেদব্যাসী মহাভারত**, প্রথম খণ্ড, পৃ ৮৩২

১১। ওই, পৃ ৮২৫

১২। ওই, পৃ ৮৩১

১৩। ওই, পৃ ৮৩৩

১৪। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সত্যের রূপ : মহাকাব্য রামায়ণে", **প্রতিক্ষণ**, ১৭ এপ্রিল, ১৯৮৯; "মহাভারত দর্পণ" **প্রতিক্ষণ**, ১৭ মার্চ, ১৯৮৯; "মহাভারতে সত্যাজিজ্ঞাসা", **চতুরঙ্গ**, এপ্রিল ১৯৯০

১৫। **বেদব্যাসী মহাভারত**, প্রথম খণ্ড, পৃ ৮২৬

১৬। ওই, পৃ ৮৩২

১৭। ওই

১৮। ওই, পৃ ৮৩৩

১৯। ওই, পৃ ৮২৫

২০। ওই, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১১৫১-১১৬৫

২১। ওই, প্রথম খণ্ড, পৃ ৮২৫

২২। ওই

২৩। ওই

২৪। ওই, পৃ ৮২৩

২৫। ওই

২৬। ওই

২৭। ওই, পৃ ৮২৬

২৮। ওই, পৃ ৮৩৩-৩৪।

# মহাভারতকথা

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

অরুণা হালদার

৪. **আকর্ষণীয় মহাভারত-চরিত্র :** কথায় বলে, যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে। অর্থাৎ পানিটুকু বুঝে নিয়ে বলা যায়, মহাভারতে যা আছে, তা-ই ভারতবর্ষে আছে; যা মহাভারতে নাই তা ভারতে নাই। আমাদের এও বক্তব্য : যা আজ ভারতে নাই, তাও মহাভারতে আছে; এবং প্রাগার্য-কাহিনী এবং অনেক হারিয়ে-যাওয়া পাশ্চাত্য ভূভাগে আকীর্ণ বিকীর্ণ ইন্দো-ইয়োরোপীয় আর্য-ভাষার বীরগাথা। সেই বীরগাথার মধ্যে একত্র বাঁধা পড়েছে মানুষবীর এবং স্বীকৃত দেবতারাও। মানুষ দেবতা হয়ে যেতে পারে—যেমন পুরন্দর ইন্দ্র বা সেনাপতি হয়ে পরবর্তী কালে দেবস্বাভিষিক্ত। যেমন নহুষ রাজা ইন্দ্রত্বকামী হয়ে মদমত্ততার জন্য অধোগামী এবং ত্রিশঙ্কুপদপ্রাপ্ত। অন্যত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র দুজনার সংঘর্ষে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি। দেখা যাচ্ছে, কর্মবশে সংস্কারপরিবর্তন করলে 'এ জনমে ঘটালে মোর জন্মজনমান্তর' হওয়া সম্ভব।

**মিশ্রপটভূমি :** বৈদিক আর্যদের মধ্যে জীবনরসপিপাসা, ভোগরাগ খুব বেশি থাকায় তাদের মধ্যে স্বর্গনরকাদির মতো মৃত্যুত্তর কল্পনা বা জন্মান্তর সম্পর্কে চিন্তাভাবনা প্রায় ছিল না। আগে না থাকলেও পরে তা হয়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল বিশেষ জন্মান্তরের কল্পনা এবং রূপান্তরিত হবার কল্পনাটা বস্তুত অষ্ট্রিক চিন্তাভাবনার সংস্পর্শে আসার ফলে। এই বিরাট নৃগোষ্ঠীর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত অনিষিদ্ধ যৌন কামনার পরিপূর্তি দোষাবহ ছিল না—এখনও তা নয়। এ রীতি তাদের জীবনানন্দের সঙ্গে যুক্ত। অপর দিকে, মানুষের পশুতে রূপান্তরিত হওয়া, পশুরও মানুষের রূপ পাওয়া বা কথা বলা এবং জন্মান্তর ধরে প্রতিহিংসা অথবা প্রেমের কামনায় ইষ্টলাভ করা এদের মধ্যে ছিল জানা যায়। মনে করতে পারা যায়, অম্বার শিখণ্ডীরূপ পরিগ্রহ ও তার প্রতিহিংসাকামনা এই ধরনের ব্যাপার। এটি ছাড়াও অন্যত্র রাক্ষস, শবর ( রামায়ণে ) নিষাদ ( এক নিষাদ রমণী ও তার পঞ্চপুত্র বারণাবতের জতুগৃহে দগ্ধ হয়, একথা স্মরণীয় ), নাগ প্রভৃতি জাতির সঙ্গে আত্মাভিমানী আর্যদের, অন্তত মহাভারতীয় আর্যদের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ দেখা যায়। হিড়িম্বা-ঘটোৎকচের কাহিনীটি অতি সুন্দর। এই ঘটোৎকচ মায়ারূপ ধারণ করতে পারত, তার মহদন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যায় আর্য পিতৃবংশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী যুদ্ধে। অপরদিকে আর্যদের বর্বরতার স্বাক্ষর আছে এই উদার ভীমপুত্রকে ইষ্টসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করার মধ্যে। অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার যা দেখা যায়, তাতে লোহার ব্যবহারের সঙ্গে গরম তুঁষ, মোম, তেলের এমনকী জীবন্ত সর্পের ব্যবহার দেখে মনে হয়—এগুলি তথাকথিত আর্যরা অনার্য সভ্যতা থেকে দেখে গ্রহণ করেছিলেন। ঘটোৎকচের চেহারাচরিত্র আমাদের নিগ্রেইড-প্রবণতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। নাগরাজকন্যা বিধবা উলূপীর অর্জুনকে আত্মদানার্থে আহ্বান এমন অনায়াস যে তার সবল প্রকাশ আমাদের বিস্মিত করে। মণিপুরও তৎকালে ঠিক ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জন করেছিল এমন বলা যায় না। বরঞ্চ সেখানকার মাতৃতান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে আমরা কিছু তথ্য পাই। আর্যরা সম্পূর্ণভাবে পিতৃতান্ত্রিক ও একতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত।

আর্যেতর প্রত্ন-দ্রবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা পুর অথবা নগরী, নদীর বাঁধ, বড়ো-বড়ো প্রাসাদ নির্মাণ করতে দক্ষ ছিল। তারা কাঁচ এবং দর্পণের ব্যবহার জানত বলে মনে হয়। ( অবশ্যই যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহনির্মাণে ময়দানবের কথাটা স্মরণীয়।) ঠিক তাকে বলা যায় না প্রক্ষিপ্ত কিনা। প্রত্ন-দ্রবিড়দের মধ্যেও মাতৃতান্ত্রিকতা ছিল। কৃষ্ণজননী দৈবকী অসুরকন্যা। যাদব-ক্ষত্রিয় বসুদেব কী ভাবে তাঁকে বিবাহ করেন তা জানা যায় না। তবে এটা অনুমান করা যায় যে, অসুর সম্প্রদায়ের নিয়মানুযায়ী ভাগিনেয় বিষয়াধিকারী। বেশিদিন আগের কথা নয়, কেরলে কোচিন রাজপরিবার পরিচয় ও উত্তরাধিকার স্থির করত ভাগিনেয় দিয়ে। রানীর পরিচিতি ছিল রাজভগ্নীর, রাজপুত্র ভাবী রাজা ভাগিনেয়। রাজপত্নীর বা আসল পুত্রের স্থান এদের নীচে। মনে হয়, কংসাসুর এজাতীয় কারণে ভাগিনেয়হত্যার প্ররোচনা পান। কৃষ্ণবাসুদেবও তাঁকে হত্যা করেন। কৃষ্ণবাসুদেব নামটি পিতৃতান্ত্রিকতাসূচক হলেও কৃষ্ণ জাতিতে কিছু আর্য, কিছু অসুর।

এই অসুরজাতি, পূর্বে বলেছি, প্রত্ন-দ্রবিড় হওয়া সম্ভব। তারা মেসোপোটেমিয়া থেকে এসে প্রাগার্য উত্তর-পশ্চিমে দীর্ঘকাল স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিল ( ৪৫০০—১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ )। সিন্ধুসভ্যতার উৎখনন দেখে তাদের নির্মাণকলা ও ইঞ্জিনীয়ারিং তথা টাউন প্ল্যানিং সম্বন্ধে এখনও আমরা ভালো ধারণা পোষণ করি।

**যৌনাচার :** ভার্গব বা ভৃগুবংশজ শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী কুরুবংশীয় যযাতি ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণী-পত্নী। শুক্রাচার্য দৈত্যগুরু। তিনি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। অপর পক্ষে, দ্রুহ্য, অনু, পুরু তিনটি পুত্র উক্ত যযাতির পত্নী বৃষপর্বা-নামক দৈত্যরাজের কন্যা শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত। পুরুর বংশই কুরুবংশ—পৌরব-কৌরব দুই নামেই তারা খ্যাত। দেবযানীগর্ভজ যদু ও তুর্বসু যথাক্রমে যদুবংশ এবং তুরুস অর্থাৎ প্রাচীন তুরস্ক-তুর্কীস্তানের রাজপুরুষ বা শাসক বলে কল্পিত হতে পারে। যযাতির পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে আরও আশ্চর্য মিশ্রণের কথা আছে। সেখানে চন্দ্রবংশীয় পুরুরবা, স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর প্রণয়াসক্ত। উর্বশী দেবযোনি কিংবা জানি না; আর দেবযোনি হলেও তার অর্থ হবে সুগঠিত সুন্দর নর-নারী। এ কল্পনা আরব-পারস্যের খানিকটা বেহেশত ও তার নিবাসীদের সম্পর্কে বুঝতে পারা যায়। স্বর্গ সর্বসুখপ্রাপ্তির দেশ। দেবপ্রিয় মানুষেরা ( এমনকী

গৌতম-বুদ্ধ) সকলেই এই দেবতাদের প্রিয় কার্য সাধন করে মাঝে-মাঝে স্বর্গবাসী হতেন। সুতরাং চন্দ্রবংশীয়দের কথা ও ইতিহাস বড়ো বিচিত্র। ইলা ও বুধের কাহিনীতে দেখি, ইলা পুরুষ থেকে নারী ও নারী থেকে পুরুষরূপ প্রাপ্ত হচ্ছেন। এরূপ জেনেটিক্যাল পরিবর্তন এবং এনডোক্রাইনল পরিবর্তন তবে তখনও হত এবং তা অভিজ্ঞ দৃষ্টির অগোচরেও থাকত না। দেবতা (চন্দ্র) ও রানীর ঘোটক-ঘোটকীরূপে দীর্ঘকালীন সম্ভোগের কথা আছে মহাভারতে। তাতে মনে হয়, পশ্বাচার অজ্ঞাত ছিল না।

**সামাজিক-অসামাজিক সংসর্গ :** ঋষি বিশ্বামিত্র ও উর্বশী অপ্সরার সঙ্গমে জাত শকুন্তলা। পাখিরা তাঁকে রক্ষা করেছিল। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে পালিতা হন। প্রণয় ও পরিণয়ের পর রাজা দুষ্মন্তের ঔরসে তাঁর গর্ভে ভরতের জন্ম হয়। এই ভরত থেকে কেউ-কেউ 'ভারত' কথাটা এসেছে মনে করেন। ভরতের বংশেই পাণ্ডব-কৌরবের জন্ম। প্রসঙ্গত, রামায়ণে উক্ত রামের ভ্রাতা ভরত কৈকেয়ীর গর্ভজাত—তিনি কেকয় বা মদ্রের (উত্তর আফগানিস্তান) রাজকন্যা এবং ঈক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যারাজ দশরথের পত্নী। দশরথ কথাটা হিট্টাইট-মিটন্নী সাহিত্যে প্রাপ্ত দুঃরথ বা তুশরথ কথাটার সমতুল্য। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, আর্যরা শতরঞ্জ বা পাশাখেলা এবং রথের প্রতিযোগিতা করতে বিশেষ পছন্দ করত এবং পারদর্শীও ছিল। সুরাপানও তাদের বর্বর প্রাণলীলার অঙ্গ ছিল। অপরপক্ষে, রামায়ণের যুগে এমনটা থিতিয়ে এসেছে। ঈক্ষ্বাকুরা সূর্যবংশীয় ছিল—ঈক্ষ্বাকু কথাটার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায় নি। তবে "সংস্কৃতির রূপান্তর" গ্রন্থে (গোপাল হালদার মহাশয় রচিত) দেখা যায়, প্রাচীন বাবিল সুমের রাজপুরুষদের মধ্যে উচ্চবর্গীয়দের ঈশক্কু বলা হত। ঈশক্কু, ঈক্ষ্বাকু, যক্ষ, পারসিক গোষ্ঠীর ভাষাভাষী বর্তমান কালে ইয়গনবি (অয়িসম্ভব-অগ্নিকুল) কথাগুলি নিয়ত আমাদের মনে কিছু প্রশ্ন রেখে যে যায়, সেটাই শব্দতত্ত্বের গুরুতর একটা ভূমিকা। ভরত কথাটা দেখছি দুটি মহাকাব্যেই আছে। দুটি মহাকাব্যের প্রধানা নায়িকার জন্মই অলৌকিক। সীতা রাবণকন্যা কোথাও বলা হয়েছে—কোথাও বা তিনি (যেমন জৈন রামায়ণে) দশরথেরই কন্যা। অতি প্রাচীন অষ্ট্রিক এবং সেমীয়-হামীয়-মিশরী সংস্কৃতিতে ভ্রাতা ও ভগিনী নীলরক্তের অধিকারী হওয়াতে রাজ-পরিবারে তাঁরা জন্মাবধি পরস্পরের পতি-পত্নী ধরেই নেওয়া হত। এ প্রথা ছিল ইনকাদেরও মধ্যে। ভারতীয় উপদ্বীপাঞ্চলে কেরালায় তার খানিকটা অবশেষ ধারানুগতি কিছুকাল আগেও ছিল। ঠিক এ জাতীয় অজাচার বা ইনসেস্ট এদেশীয় মহাকাব্য দুটিতে দেখা যায় না। এত বেশি পলিগেমি-প্রথা প্রচলিত ছিল যে সম্ভবত যৌনবিকার বেশি বিস্তার লাভ করে নি। আরও ছিল অনিষিদ্ধ সহবাসপ্রথার প্রচুর সমর্থন, বিশেষ মহাভারতের যুগে।

**কৃষ্ণকথা :** প্রসঙ্গত কৃষ্ণের কথা ধরা যাক। তাঁর বাল্যলীলার মাখনচুরি এবং কৈশোরের ঈভটিজিং আমাদের আধুনিক মনে বিরাগ জাগায়। কিন্তু তাঁর আইডেনটিটি আমরা ঠিক করতে পারি না। তিনি গোপ এবং গোরক্ষক হিসাবে আর্য ইন্দ্রের বিপক্ষে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেন। ষোলোশত গোপনারী তাঁর বংশীধ্বনিতে প্রেমে বিবশ হয়ে গৃহত্যাগ পতি-পুত্রত্যাগ করে। মথুরাতে তাঁর মাতুলরাজ্য বেশিদিন তিনি আয়ত্তে রাখতে পারেন নি। কংসাসুরের শ্বশুর জরাসন্ধ তাঁকে বৃন্দাবন মথুরা ছাড়তে বাধ্য করেন বারবার আক্রমণে। তাঁদের স্থিতি হল শেষে সৌরাষ্ট্রে দ্বারকা-প্রভাস-রৈবতকে। সাতটি বড়ো-বড়ো দল এবং তাঁদের কুলপতি উগ্রসেন বা বলদেবের পিতা। বলদেবের অস্ত্র হল হল বা লাঙ্গল। এটি আশ্চর্য প্রতীক এবং সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ। অপরদিকে কৃষ্ণের প্রতীক অস্ত্র হল চক্র। এটি মারক অস্ত্র বলে বর্ণিত হলেও আমরা জানি মানবেতিহাসে এই চক্র বা চাকা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ অন্তত ষোলো-হাজার কন্যাকে (নরকাসুরকে পরাস্ত করে তাঁর কন্যাদের) বিবাহ করেন। এ ছাড়াও তাঁর আটজন প্রধানা মহিষী তথা দুজনা অন্তরের কাছাকাছি ছিলেন। প্রধানাদের মধ্যে জাম্ববতী ঋক্ষরাজকন্যা অর্থাৎ ভল্লুক টোটেমের লোক। এ ছাড়া শৈশব কৈশোর থেকে তিনি নানা দৈত্য-দানব-অসুর-রাক্ষসদের সঙ্গে সংঘর্ষে এসেও রক্ষা পান। অলৌকিক শিশু হিসাবে সর্পরাজ বাসুকী তাঁকে ফণার তলে রক্ষা করে যমুনা পার করায়। তিনি কালীয়দমন করেন। শেষনাগ তাঁর সুখশয্যা। বাসুকী তাঁর সুহৃদ। তিনি কৃষ্ণবর্ণ। বলদেব গৌর তথা শুভ্রবর্ণ। তবে সর্পপ্রীতি হয়তো তাঁরও ছিল। বলদেব দেহত্যাগ করার পর হরিবংশ অনুসারে তাঁর নাসা থেকে একটি বহুফণ সাপ নির্গত হয়ে শ্বেতদ্বীপের অভিমুখে চলে যায়। কৃষ্ণের মৃত্যু হয় ব্যাধের শরে। এত বড়ো যুদ্ধ পরিচালনা করার পর, নিজকুল শুধুমাত্র আত্মধ্বংস করার পর তিনি কিন্তু আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। মনে হয় তিনি শেষ পর্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন—যাকে আমরা মানসিক ডিপ্রেশন বলি, তাই তাঁর হয়েছিল।

বর্তমানে এখানে আমাদের হল ও চক্র দেখেই একটা ব্যাখ্যা দেবার প্রবণতা এসে যেতে পারে। তা করা উচিত হবে না। বড়োজোর বলা যেতে পারে যাদবরা ঘোষযাত্রা বাদ দিয়ে ক্রমশ হয়তো কৃষিজীবী (সদ্‌গোপ নামটি স্মরণীয়) হয়ে উঠেছিল। অস্ত্র-শস্ত্র হিসাবে চক্রধর বাসুদেব তা নিয়ে যুদ্ধ করেন নি, তবে তাঁর এই চক্রধর হওয়ার অর্থ আমরা এখনও পাই না। এটুকু বলতে পারি, তখনকার নীতি অনুযায়ী তাঁর এই বহুসংখ্যক বিবাহ রাজনীতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এতে করে তাঁর বহুদেশের বহু-রাজার আনুকূল্য লাভ করার কথা। তবে এই যাদব ক্ষত্রিয় এবং কুরুকুলের মধ্যে বিবাহপ্রথা যা ছিল তাতে মনে হয় নিকট বা দূর আত্মীয় বিবাহ তাঁরা করতেন এবং সেটাও হত রাজনীতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

কৃষ্ণের পুত্র অনেক নয়। শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—কটির নামই বা আমরা পাই? এর মধ্যে পিতা হয়েও তিনি শাম্বকে শাপ দেন বলে বলা হয়। শাম্ব কুষ্ঠগ্রস্ত হয়ে সুঙ্গ বা শকদেশে যান। সেখানকার সূর্যোপাসক পুরোহিতদের চিকিৎসায় ভালো হন এবং এই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বা মগব্রাহ্মণদের জম্বু-দ্বীপে নিয়ে আসেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের বসবাস করানো। এজন্য কাশ্মীর থেকে কলিঙ্গ পর্যন্ত কয়েকটি মার্তণ্ড-মন্দির স্থাপিত হয়। এগুলি এখনও অজানা নয়। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণও বিহার ও উড়িষ্যায় প্রচুর। তাঁরা বৈদ্যশাস্ত্রী বলে নিজেদের বলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গয়ার পুজারীগণ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। দীর্ঘ শালপ্রাংশু অরুণাভসুগৌর দেহবর্ণ নীলচক্ষু তাদের বিশিষ্টতা গোপন করে না।

**নরনারায়ণ :** আর্যঋষি নারায়ণ, আর্যদেবতা বিষ্ণু এবং কৃষ্ণবাসুদেবের সিনক্রেটিক ছাঁচগুলি মিলিয়ে একত্র করার পর্ব সহজ হয় নি। বিষ্ণুও আর্যদেবতা কিনা সন্দেহ। বিষ্ণু বা বিনহু প্রকৃত প্রত্ন-দ্রবিড় দেবতা এবং আর্যদের দ্বারা গৃহীত বলে মনে হয়। (বিনহু=নীলবর্ণ দেবতা)। আর বলা হয় নর ও নারায়ণ দুই ঋষি ছিলেন। তাঁরা উভয়ে পরোপকারী ছিলেন। এই নারায়ণ কথাটি ও নর কথাটির ভাবার্থ মানুষ। (শ্লাভ শব্দ নারোদ মানে নর—নারোদনিকী মানে মানবীয়)। সুতরাং নারায়ণ ও নারদ নামের চারণ কবি মানবীয় হওয়াই সম্ভব। কৃষ্ণকে এভাবে নারায়ণের সাথে কবে বা কেন মেশানো হয় তা বলা যায় না। তবে অবিসংবাদী ভাবে বলা যায় যে এরূপ চরিত্রের পরিকল্পনা যিনিই করুন তাঁর প্রতিভা অবিসংবাদিত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও কৃষ্ণবাসুদেব দুজনই পুরুষকারের চিত্র। জন্ম সম্পর্কিত বহুবিধ জটিলতাকে তাঁরা অতিক্রম করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

**কুলপরিচয় :** জন্মবিষয়ক পরিস্থিতি নিয়ে বিপন্ন বিদুর এবং কর্ণও। বিদুর শুধু ধর্মাত্মা নন। তিনি বহু-ভাষাভাষী এবং প্রকৃত নির্লোভ ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তিনি ম্লেচ্ছ ভাষায় কথা বলেন পাণ্ডবদের সতর্কীকরণের জন্য। এতে করে মনে হয় তথাকথিত ম্লেচ্ছজাতিও মহাভারতের সময় অজানা ছিল না। এবং এ ভাষা সেদিন সমাজে অপরিচিত ছিল না। স্বয়ং গান্ধারী ( কান্দাহারী ) গান্ধারবাসিনী ছিলেন। গান্ধার তৎকালে পিশাচ দেশ বা আফগানিস্তান হওয়া সম্ভব। পিসাত বা পিশাচ মানে শ্লাভ ভাষায় লেখা। পিসাতেল মানে লেখক ও বিদ্বান লোক। সে সময়কার গান্ধার এবং আরও পরে বহুবর্ষ ধরে গান্ধার ও তক্ষশীলা উদীচী অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। তথাকথিত আফগানরা কারা ছিল বলা শক্ত। একটা কথা প্রচলিত আছে যে ইসরায়েল-দের বারোটি শাখার ছটি শাখা লুপ্ত হয়ে যায়—পরে খোঁজ পাওয়া যায় যে একটি শাখা বুঝি আফগানি-স্তানে আশ্রয় পায়। এরা সেমেতিক-হেমেতিক। আরও ছিল প্রান্তীয় দর্দশাখার মানুষেরা। কণিষ্ক বা শাহীবংশীয় কুষাণগণ দীর্ঘকাল এখানে রাজত্ব করেন। তক্ষশীলা মথুরা সে সময়কার সংস্কৃতিকেন্দ্র। অর্থাৎ হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আফ-গানিস্তান আশ্চর্যভাবে নিজের গৌরব বজায় রেখেছে। শাহিয়া বংশ শেষ হবার পর পারসিক ( কাবুলী ) জাতি এসে বসবাস করেন। পাণিনির শাসাতুর গ্রাম কণিষ্কের গান্ধার তক্ষশীলা সেই গান্ধারীর সময়কার ঐতিহ্য নিয়ে বয়ে এসেছে।

৫। **বিবিধ উদাহরণ :** মহাভারত শুধুই কৃষ্ণ-কথা নয়। মহাভারত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধগাথা বা বীরগাথা মাত্রও নয়। কোনো বিশেষ মানুষ বা জাতির অভ্যুদয়-বিলয়ও তা নয়। বস্তুত যে মিশ্রজন ও মিশ্র-ভাষা ও মিশ্রসংস্কৃতি নিয়ে পরবর্তী কালের ভারতবর্ষ, মহাভারতেই তার আদি এবং চলমান পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতের মানুষেরা উষ্ণরক্তের মানুষ। রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে এইখানে তার বড়ো প্রভেদ। রামায়ণের চরিত্রকথাও গীত হত। কিন্তু চরিত্রের রূপগুলি একটু রিজিড—মহাভারতের চরিত্রগুলি স্থিতিস্থাপক। তাদের আমরা মনে করি 'সেখানে মানুষগুলো ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে।' তাদের মুখে যেন চেনা-অচেনার উলকি পরানো। অথচ রামায়ণের চরিত্রগুলি সেই হিসাবে স্থির করা, পরিচালিত এবং নিষ্প্রাণও বটে। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ ভগবান বলে কোথাও বলা হয় নি। রামায়ণের রাম কিন্তু ভগবানের অবতার রাজন্যশক্তির প্রতিভূ। এই প্রভেদ অনুভব করা যায়। রামায়ণে যা হবে তা যেন বলাই আছে। মহাভারতের চরিত্ররা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়—কর্মফল ভোগ করেও ক্ষাত্র-শক্তি ও আত্মশক্তির দোহাই দেয়। তার এই রূপ শান্তিপর্ব অনুশাসনপর্ব এবং তারই মধ্যে সংগৃহীত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দার্শনিক উক্তি দিয়েও চাপা দেওয়া যায় নি। অপ্রাকৃত বহু ঘটনা আছে ঠিকই, তবে প্রায়ই সেসকল অপ্রাকৃত ঘটনায় প্রাকৃতকরণ উদ্ঘাটিত হয়। রামায়ণে সেগুলি দৈবকার্যসাধনতৎপর ভগবদিচ্ছা মাত্র। যে কারণেই হোক, ছটি মহাকাব্যই মূলত পিতৃসত্তাপ্রধান হওয়াতে নারীরা অবহেলিত। তাদের ব্যক্তিত্ব অসাধারণ হলেও তাদেরকে অস্বীকৃতিই জানানো হয়েছে। তেজস্বিনী কৃষ্ণ-দ্রৌপদী এবং বাল্মীকি রামায়ণের তেজস্বিনী সীতা দুজনাকেই কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। প্রভেদের মধ্যে মহা-ভারতের সমাজ বহুপত্নীক ( বহুপতিকও )। রামায়ণের ব্যবস্থা একপত্নীক এবং আদর্শনিষ্ঠাকে সম্মান করেছে। তবে সেখানে সতীত্ব সম্বন্ধে কড়াকড়ি খুবই বেশি।

**মহাভারতনীতির মৌলিকতা :** প্রসঙ্গত বলা যায়, মহাভারতনীতির একটা বিশিষ্ট মৌলিকতা আছে। বহুজাতিক মানুষ ও বহুভাষিক মানুষ যেভাবেই হোক ভারতে বা জম্বুদ্বীপে এসেছে। তারা একেবারে মিশে গেছে একথাও সত্য নয়; তেমনিই একেবারে ভিন্ন হয়ে আছে, তাও বলা







চলবে না। প্রাগার্য মানুষ, আর্য, আর্যেতর মানুষের ধারা যেমন এসেছে গেছে, তেমনই তাদের কিছু ছাপ রেখেই গেছে। সেটা অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারি যে ব্যাপারটা আজকের মতো সেদিনেও স্বাভাবিক ও আধুনিক ছুই-ই। এটি হল মানুষের পথ খোঁজা—মানুষের মানুষকে বোঝা এবং সঙ্গে-সঙ্গেই নিজের মধ্যস্থ আত্মদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হওয়া। এই ইথস বা মানবমঙ্গলনীতিই তার অন্বিষ্ট। এখন প্রশ্ন উঠে : এটি কী বা কী করে পাওয়া যায়?

উত্তরে বলা যায় যে, আমরা আধুনিক মন নিয়ে প্রাণের বিকাশ বা জীববিবর্তনের বিকাশধারাটি অনুসরণ করলে দেখি—সমাজবোধ বা এথিকসও সেই পথে, মানবীয় যুক্তির বিবর্তনের পথে আবির্ভূত হয়েছে। বিকাশ-বিবর্তনের প্রতি স্তরেই সংঘর্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকে। জীববিবর্তনের পথে পদ্ধতিতে মানস তথা স্নায়ুতন্ত্রের পরিবর্তন সাধিত হয়। বিকাশের স্তরে ( পাভলভীয় মতানুসারে ) মস্তিষ্কের বল্কল পূর্ণতর পুষ্টতর হয় ( সেকেনড সিগন্যালিং সেনটার আবির্ভূত হয় )। এর সাথে-সাথে চেতনারও রূপান্তর ঘটে। আমরা বাহুল্যভয়ে এ বিষয় অগ্রসর হতে চাই না। পূর্বসূরীদের মধ্যে হার্বার্ট স্পেন্সার, আলেকসান্দার প্রভৃতির মতে নীতিগত চেতনা বা শুভাশুভবোধও এরূপ এক ইতিহাসের পথে সমুত্তীর্ণ হয়েছে। মহাভারত রচনার কয়েক শতাব্দীর পরে বৌদ্ধশাস্ত্রে বলেছে, অভ্যাসদ্বারা কুশল বা শুভ আয়ত্ত করা যায় এবং অভ্যাসদ্বারাই অকুশল ও প্রমাদ পরিত্যাগ করা যায়। সেটাও একপ্রকার আধুনিক রীতির কনডি-শনিং, ডিকনডিশনিং ও রিকনডিশনিঙের ক্রিয়া-ফল। এখন এই ক্রিয়াফল যার উপরই আধারিত হোক, সমাজচেতনায় এই বোধের প্রয়োজন আছে। সমাজচেতনার মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে এই বোধকে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে।

পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা যা বলতে চাই তা হল—মহাভারতে বহুপ্রকারের মানুষ ও দেশ পাওয়া যাচ্ছে। তারা অনেকেই বর্বর সমাজভুক্ত। বর্বর সমাজের নিয়মেও সমাজচেতনা আছে—শান্তি আছে। ন্যায়-অন্যায়ও আছে। তবে সেই বিচারের ধারায় যেরূপ নীতিজ্ঞান স্বীকৃত হয়, সেটা একধরনের সামূহিক বা ট্রাইবাল বা গোষ্ঠীগত নীতিজ্ঞান। গোষ্ঠীতে যা স্বীকৃত তাই ঠিক—গোষ্ঠী-ভুক্ত নির্বিচারে তা মেনে নেবার কথা। গোষ্ঠীগতভাবে আবার অন্যায় যা আমাদের মতে, তাকেও সমর্থন করা চলত। বস্তুত রাজনীতিক্ষেত্রে তো এখনও তাই চলে। অত্যাধুনিক বিশ্ববীক্ষাতেও তা দেখা যাচ্ছে, ধরা পড়ছে। কিন্তু, এই নীতিজ্ঞান, ইথস-এর বিচারে বহিরঙ্গ। এ নীতি বিবেক নয়। অর্থাৎ নীতিজ্ঞান বা মরাল কনশাসনেস এবং বিবেক বা কনশ্যান্স—এদুটির মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য আছে। তাহলেও দেখা যাচ্ছে—মহাভারতের সময় থেকে এখন পর্যন্ত এই দুই প্রকার ভাবনাই মনুষ্যজগতে স্বদেশে বিদেশে বর্তমান। জোর যার মুলুক তার কথাটি তো মিথ্যা নয়। আবার বিবেকও তো মিথ্যা নয়। বিবেকশীলতা যুক্তি-প্রসূত—একান্ত মানবীয় এবং একেবারে ব্যক্তিক। বিবেকনিষ্ঠা আদেশপালনমাত্র নয়। আদেশপালনের অভ্যস্ত ক্রিয়ায় বিচারশূন্যতা মাত্র নয়। বর্বর যুগ থেকে উর্ত্তীর্ণ হবার পথে, সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করার মুখেই হল চেতনার এই সিংহদ্বার। বাইরের সংগ্রামের চেয়ে কম তীক্ষ্ণ সূচীমুখ চেতনা নয় বিবেকদংশনের। 'মনের অগোচর পাপ নাই'—কথাটিও খুব সত্য। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলে কোনো মানুষই এই শাশিত সংঘর্ষ এড়াতে পারে না। এ কারণেই গান্ধারী যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ কথাটি বলতে পারেন।

মহাভারতের শত-শত চরিত্র অবলোক-আলোচনা করলে দেখা যাবে এই চরিত্রের মানুষগুলি কীরকম-ভাবে সজীব। এ সজীবতা তাদের কর্মলক্ষণায় ব্যঞ্জিত হচ্ছে। স্থূল অন্যায় যে করছে সে তার চিত্তের কাছে জেনেই করছে যে এটা অন্যায় হলেও

বলদর্পে তা করা সম্ভব। যাকে আমরা ষড়রিপু বলি সেগুলি হল কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। এগুলিকে আধুনিক পরিভাষায় প্যাশন কিংবা প্রপাগেশন বলা যেতে পারে। কৌরব পাণ্ডব যাদব সকলেই আবালবৃদ্ধবনিতা এই ছয়টি রিপুর বশবর্তী হয়ে কর্মরত। তারা মানে 'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। জানাম্যধর্মং ন চ নিবৃত্তিঃ॥'

একরকম ক্রিয়া হল ধর্মাধর্মবিচার না করে কাজটা নীতিগতভাবে করে যাওয়া। অন্যটি হল দুই প্রকার কারণ অর্থাৎ পরস্পর প্রতিযোগী ধর্ম ও অধর্মের সংঘর্ষকে জেনে, ফলাফল ও ঔচিত্যবোধ মেনেও অন্ধ আবেগতাড়নায় মন্দ কাজটা করা। যেমনটি ঘটেছিল দ্রৌপদীকে সভামধ্যে এনে অন্যায় দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাস্ত তাঁর স্বামীদের সামনেই শুধু নয়, কুরু ও পাণ্ডব বংশের পিতামহ ও গুরুদের সামনে তাকে লাঞ্ছিত করা। এটা একদিকে বর্বর বলদর্পীর ঔদ্ধত্যসূচক। অপরদিকে যখন পিতামহ ভীষ্ম বা গুরু দ্রোণ, এমনকী বিদুরও দ্রৌপদীর স্পষ্ট অভিযোগের জবাব দিতে পারেন নি, তাঁরা দুর্যোধনের অন্ন খান বলে তাকে প্রকারান্তরে সহায়তা করেছেন। নিজেদের বিবেককে অন্যায় জেনেও ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন বলা চলে। অপরদিকে দ্রৌপদীর পঞ্চপতি আর্যপুরুষদের বাসন দ্বারা পাশাখেলার জন্য উৎসুকতাবশত হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে রাজ্য, ভ্রাতা, নিজসত্তা ও দ্রৌপদী সবাইকে অসঙ্গত পণ রাখেন। গান্ধারদেশজ শকুনি কপট পাশায় পরাভূত করেন। নিজেদের ব্যক্তিগত মানসম্মান ভুলে পিতৃ-সত্তার প্রতিভূ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্যায় আচরণ সকল ভ্রাতারা কেন মেন নেন আমরা বুঝতে পারি না। কর্ণ কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র—কারও আচরণই সঙ্গত সমীচীন নয়। এর মধ্যে দৃঢ় চরিত্র একজনারই—তিনি গান্ধারী তাঁর পাতিব্রত্য সুচিন্তিতভাবে অভিব্যক্ত। দোষগুণ বাড়াবাড়ি যাই হোক তিনি তাঁর কথার দাম জানেন। তাঁরই ভ্রাতার এই অসদাচারণ তিনি রোধ করতে পারেন না। কেউই পারেন না, যদি নিজে থেকে বুঝে মানুষ পাপাচরণ থেকে নিবৃত্ত না হয় অথবা জেনে বুঝে ধর্মাচরণ না করে।

তারপর মহাভারতের যুদ্ধ শুধু নয়। যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধরাজা হিসাবে, স্নেহান্ধ পিতা হিসাবে সতত পুত্র-জামাতার অশেষ অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই অন্যায়-সিন্ধুর মধ্যে প্রতিবাদী বিদুর ও বিকর্ণ কী করতে পারেন? কুন্তী সতত একটা অপরাধবোধে ভোগেন। অঙ্গরাজ কর্ণ ধর্মাচরণে অনন্য। কিন্তু তাঁরও জন্মরহস্য নিয়ে কমপ্লেক্স ছিল। সব জেনেও কিন্তু তিনিও মনুষ্যোচিত আচরণে পরাঙ্মুখ নন। তিনি বীর, তিনি মহাদাশয়, তিনি বঞ্চিত—কিন্তু সর্বোপরি তিনি ওই ধর্মবোধের স্বভাবজ কবচ-কুণ্ডলে সমাবৃত। আধুনিক যুগের সঙ্গে তুলনা করলে এর সবই মাত্রাবহির্ভূত মনে হতে পারে। কিন্তু একটি কর্ণ, গান্ধারী তথা দাসীপুত্র ধর্মাত্মা বিদুর সহজ ও স্বাভাবিক মানবতাবোধে সর্বকালের সর্বদেশের পক্ষে আদরণীয়।

তেমনই মাত্রাহীন রাজনীতিকতা কৃষ্ণের। তৎকালে এমন মেকিয়াভেলির কল্পনা খুব আশ্চর্য মনে হয়। দশম খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে কৌটিল্য না হন তৎসম কোনো রাজনীতিবিদের ধারা নিশ্চয় ছিল। তা না হলে কৃষ্ণ-বাসুদেব তাঁর নানারকমের জেনেটিক্যাল প্রবাহ ও কুমতি-সুমতির দ্বন্দ্ব জেনেও কুমতিকে সুমতির রূপ দেবার প্রবণতা পেলেন কোথা থেকে। দ্রৌপদী রাজরানী হলেও পত্নী। ঈপ্সিত জনকে তিনি পান নি। তাঁর অসাধারণ কাণ্ডজ্ঞান তাঁকে সর্বদা এক আশ্চর্য নারীত্বগৌরবের জ্যোতির্বলয়ে ঘিরে রেখেছে। পঞ্চপতির সকলেই বহুবল্লভ। সে সূক্ষ্ম অভিমানও তাঁর অগোচর থাকে নি। তেমনই শক্ত আশ্রয় তিনি পেয়েছেন তাঁর মধ্যম পাণ্ডবপতির কাছে। দ্রৌপদী চরিত্র এমনই একটি প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র। মহাভারতকার যিনিই হন, তিনি অনেক যত্নে এই মর্ত্য মানবীকে মানবীয় দুঃখ-সুখ জয়-পরাজয় মানাপমানের মধ্য দিয়ে তৈরি করেছেন। সুভদ্রাও অসামান্যা নারী। কিন্তু, তিনিও দ্রৌপদীর কাছে ম্লান। মহাভারতকার যে কথা আধুনিক মনের কাছে পৌঁছাতে পারেন নি সেইটুকু কিন্তু নবীনচন্দ্র সেন তাঁর "কুরুক্ষেত্র" "রৈবতক" ও "প্রভাস" নামের তিনটি গীতিকাব্যের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। এখানে সুভদ্রাকে অনেকটা আধুনিক ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মতো কিংবা সেবাশীল রেডক্রসের মতো করে তিনি বর্ণনা করেছেন।

তুলনামূলকভাবে দেখলে বোঝা যায়—দ্রৌপদী ঠিক যেন কোথাও কৃষ্ণের হাতে পাশার ঘুঁটি হয়ে ওঠেননি। সুভদ্রার বিবাহ কিন্তু কৃষ্ণের শুধু অনুমতিতে নয়, ব্যবস্থাপনাতেই হয়েছে। কৃষ্ণকে ভাগবতসত্তা করে নির্মাণ করতে মহাভারতকার অবশ্যই মানুষের যুক্তি ও যুক্তিবাদকে মুখ্য বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা বোঝেন নি যে যদি ভাগবতসত্তার ঐশ্বর্য দ্বারা শুধু-মাত্র কার্যসিদ্ধিই ঘটে এবং তথাকথিত ঈশ্বরতাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না, তাহলে সেই অদৃষ্টসূচক নিয়ামক বা বিধায়ক ভগবান মানবজীবনের সহায়ক শক্তি আর থাকেন না। তাঁকে ডেসপট বা অটোক্রাট বলা যায়। এবং সেজাতীয় ঈশ্বরত্বগুনের যুক্তি আমরা পূর্বেই দেখে এসেছি। এ ছাড়াও কৃষ্ণচরিত্র নিজের অন্তর্গত দ্বন্দ্ববৈষম্যে দুর্বল। বস্তুত, কৃষ্ণ যতরকম ছলনা-পারম্পর্যের দ্বারা কার্যসিদ্ধি করেছেন তাতে করে তাঁকে আমরা কতকটা গ্যেটের "ফাউস্ট" অথবা মারী করেলির "সরোজ অভ স্যাটানের" স্যাটান চরিত্ররূপে দেখতে পাই।

অভিমন্যু কৃষ্ণের ভাগিনেয়। তাকে অন্যায় যুদ্ধে মারা হয়। ভীষ্ম-দ্রোণের মৃত্যু, কর্ণের মৃত্যু, জয়দ্রথের মৃত্যু প্রত্যেকটিই সুপরিকল্পিত মিথ্যা সাজিয়ে তৈরি করা। অশ্বত্থামা যেভাবে দ্রৌপদীর পুত্রগুলিকে হত্যা করেন তাও ভয়াবহ। খাণ্ডবদাহন, নগরপত্তন, রাজসূয়-যজ্ঞের দ্বারা অন্যান্য রাজাদের খর্বীকরণ (যেমন জরাসন্ধ)—এসব কাজই কৃষ্ণের। কৃষ্ণের সঙ্গে নাগ-দের যোগ এবং দ্বন্দ্ব দুইই ছিল বলে অনুমান করা যায়। কৃষ্ণের কল্পনায় আমরা যেন পরবর্তী কালের কৌটিল্য-চাণক্যের একটি আভাস পাই। অথচ এই কৃষ্ণচরিত্র যুগে-যুগে এদেশের মানুষকে আকৃষ্ট করে এসেছে। বাসুদেব-পাঞ্চরাত্র ও ব্যূহবাদ ভিন্ন-ভিন্ন বৈষ্ণববাদৈতবাদে শ্রীকৃষ্ণের নানারূপের জয়জয়কার। ইন্দ্র মহেন্দ্র হলে তিনিও উপেন্দ্র। ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর কল্পনায় তিনি এ ভুবনের কর্তা ও পালক দুইই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় আদর্শের উৎস ধরে অগ্রসর হয়েছেন। এসব সত্ত্বেও মহাভারতের কৃষ্ণ একই সঙ্গে অতিমানব এবং অসহায় মানব দুইই। তাঁর নীতি নির্মম এবং নিরপেক্ষ বলা হলেও অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং পক্ষপাতদুষ্ট। এমনটি পাশ্চাত্যদেশের এরিয়ন দেবসমাজে দেখতে পাওয়া যায়—এটি ব্যতি-ক্রম নয়।

মহাভারতের বহুচরিত্রের মধ্যে কেউই ঠিক টাইপ চরিত্র নয়। সেদিক দিয়ে রামায়ণের চরিত্রগুলি অনেকটাই যেন টাইপের মধ্যে শিলীভূত বা ক্রিস্টা-লাইজড্। রাম বা সীতা বা দশরথ বা ভরত-লক্ষ্মণ সবাই যেন যেমনটি হওয়া উচিত সেইরকম। মানুষ যেমন, তাঁরা তা নন। অথচ এই মহাভারতের চরিত্র-গুলি অমানুষ বা অতিমানুষ কেউই নয়। দশরথ ও ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে তুলনা করলে তা বোঝা যায়। কৃষ্ণের মতো রামও ভাগবতসত্তা-ভগবদবতার। কিন্তু রাম দ্বন্দ্বসময়হীন। তিনি আদর্শ রাজপুত্র—আদর্শ পুত্র, আদর্শ শত্রু (রাবণের)। স্বামী হিসাবে তিনি অবিবেচক নিষ্ঠুর। রাজা হিসাবে তিনি প্রজারঞ্জনার জন্য স্ত্রীর পরীক্ষা নেন—তাকে গর্ভাবস্থায় বনে পাঠান, আবার শম্বুক তপস্বীকে শুধুমাত্র শূদ্রত্বের জন্য বধ করেন। তিনি মনেও করেন না যে সীতা বা শম্বুকও তাঁর প্রজা। বাল্মীকির সীতা অবশ্যই তেজস্বিনী নারী। দ্রৌপদীর মতো তাঁরও জন্ম রহস্যাবৃত। তাঁর পতিগতপ্রাণতা তাঁর মহিমা খর্ব করেছে। দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর এইখানে পার্থক্য। তবে দুটি মহাকাব্যের

ট্রাজিডি আমাদের মর্মস্পর্শ করে। দুটিতেই এক-একটা যুগের চিন্তাভাবনা চেষ্টা উদ্যম সহ ভারতীয় বিভিন্ন জাতির দ্বন্দ্বসমন্বয়ের একটা খসড়া পাওয়া যায়। দুটির কোনোটিই ইতিহাস নয়—দুটিই গ্রন্থ। হয়তো গ্রন্থ হিসাবে কাল্পনিক গ্রন্থ। কিন্তু কোনো কল্পনাই যখন বাস্তববিরহিত হতে পারে না তখন সেই নীতি অনুসারে মহাভারত ও রামায়ণে সত্য বা বাস্তবের প্রতিফলন আছে। কিন্তু তা অপৌরুষেয় বাঙ্ময় নয়। তা বড়ো মাপের কাব্য। তার সুর লিরিক্যাল নয়। বরঞ্চ রামায়ণ-মহাভারতের অসংখ্য কাহিনীপরবর্তী কবিদের লেখকদের এমনকী আধুনিক কালের লেখকদেরও লেখার প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার বেশি কিছু বলা অনুচিত। দেবস্য কাব্যম্ বলাও ঠিক নয়—কারণ দেবও তো যুগবিশেষের মানুষের মনের কল্পনায় সৃষ্ট। আর্য আর্যেতর ইন্দো-ইয়োরোপীয় শুধু নয় অন্যান্য জাতির ইতিবৃত্তান্ত ও দেবদেবীকল্পনা নিয়ে এজাতীয় রচনা পৃথিবীর সর্বত্র সকল জাতির মধ্যেই আছে। আচার্য সুনীতিকুমারের একটি গ্রন্থ প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি। বইটির নাম **Ten Literary Complex of the World**—এ গ্রন্থে বেদোপনিষৎ সহ রামায়ণ মহাভারত এবং রবীন্দ্ররচনা তিনটিই ভারতীয়। তা বাদ দিয়ে জর্মন-টিউটন কাহিনী আছে—আছে গ্রীকদের বীরগাথা। মনস্তাত্ত্বিক নিয়মানুসারে প্রতি নৃকুল মানবগোষ্ঠী কোনো না কোনো প্রকারে পার্থিব-অপার্থিব লৌকিক-অলৌকিক কাহিনী মিলিয়ে নিজেদের চলমান জীবনের খণ্ড-খণ্ড চিত্রাভাসে নিজেদের কিছু পরিচয় রেখে যায়। মহাভারতও তদধিক কিছু নয়। এই কথাটা পরিষ্কার মনে রাখলে মহাভারতের প্রতিও অবিচার হয় না—যেমনটি বর্তমান দূরদর্শনের কল্যাণে স্বল্পশিক্ষিত মানুষের মনে ভ্রান্তিজাল প্রসারিত হচ্ছে। আর, মানুষের উৎকৃষ্ট কল্পনা, শুভবোধ বা ইথস এবং যুক্তিপ্রবণতার প্রতিও সুবিচার হয়। মহাভারত-রামায়ণ আমাদের জাতীয় জীবনে তাহলে আজকের দিনের ভয়াবহ ভূমিকাও নিতে পারে না।

মহাভারত (রামায়ণ প্রায় পূর্ণনির্মিত কাব্য) —গ্রন্থ হিসাবে এককালীন সৃষ্টি নয়। কীভাবে তার অণু বা ন্যূক্লিয়াস তৈরি হয়েছে, তার চারপাশে মণ্ডলাকৃতি পরিপার্শ্ব বা পেরিফেরি গড়ে উঠেছে তা বলা শক্ত। সেই গড়ে ওঠার পথেও প্রতিবন্ধকতা অনেক। তা সত্ত্বেও মহাভারতের গড়ে ওঠার পথ জয়রথচক্রের কালযাত্রা, নিষ্পেষিত মানুষের অজ্ঞাত অলিখিত লুপ্তি, নানান অর্ধজাগ্রত জাতিসত্তার লোপ, নাগদহন, নগরপত্তনকালে শত-শত মানুষের ঘরছাড়া নিরুদ্দেশ যাত্রা, অসহায়ের প্রতি দর্পীর দমনলীলা —এ সকলই আজকালের দিনের রাজনীতিচক্রে মিশবে। প্রভেদের মধ্যে আজকাল বরঞ্চ আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও পরাভূত বিবেককে জাগ্রত করতে পারে না। বরঞ্চ মহাভারতের যুগে বিবেক জাগ্রত ছিল। ছিল বলেই শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণ ও দোষ স্বীকার। তার আগে কুরুপাণ্ডব সংসারের প্রৌঢ় মানুষদের বানপ্রস্থাবলম্বন ও একপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত-সাধন। কিন্তু যাদের কথা পাওয়া যায় না, দেখা যায় না, তারা রাজপুরুষ নয়—তারা দলিত ও শাসিত। তারা দাসদাসী কিনা জানি না তবে তারা জানত যে তাদের স্থিতি ও বিনাশ নির্ভরশীল শুধু মাত্র রাজরাজড়াদের খেয়ালখুশির উপর। পারস্পরিক কলহে রাজায়-রাজায় যুদ্ধে এই উলুখড়দের সম্পর্কে মহাভারতকার নীরব। তাঁদের মরণে অধিকার আছে। শংসপ্তকগণ কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করে মরে যায়। (এই নামটির ভাষাতাত্ত্বিক ব্যুৎপত্তি এখনও জানি না)।

**উপসংহার :** এই সামান্য রচনায় বহুবিধ বর্ণন-যোগ্য মহাভারতের বিষয় বাদ পড়ল। আমার অ্যাপ্রোচটা মূলত ভাষাতাত্ত্বিক তথা সোশিওলজি-অ্যানথ্রোপলজির মধ্যে রাখার প্রয়াস করেছি ঠিকই। তা সত্ত্বেও মাঝে-মাঝে আমার প্রয়াস তার কথনসীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। "মহাভারতের যুদ্ধ" প্রবন্ধে ("মাননমনে" প্রকাশিত) আমি মহাভারতে যে-যে







দেশ যোগ দিয়েছিল, যে-যে নৃকুল অংশ গ্রহণ করেছিল এবং যুদ্ধরীতি ও যুদ্ধাস্ত্র কিছু-কিছু বর্ণনা করেছিলাম। দুই ক্ষেত্রেই আমার আধার মূলত মূল মহাভারত এবং আচার্য সুনীতিকুমারের কিছু প্রাসঙ্গিক রচনা। (মিড্‌ল্ ইণ্ডো এরিয়ান এণ্ড হিন্দী, কলেক-টিভ পেপারস্ ইত্যাদি)। ভাবনাচিন্তার ত্রুটি ও মৌলিকতা আমার নিজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব। তা সত্ত্বেও বর্তমানে উপলক্ষে কিছু-কিছু রচনার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ এখানে কর্তব্য মনে করি।

কম্প্যারেটিভ লিটারেচরের দিক থেকে বুদ্ধদেব বসু "মহাভারত" লেখেন—তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি যুধিষ্ঠির চরিত্রটিকে আশ্রয় করেছে। গত শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্র" এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা এবং আধুনিক ও পাশ্চাত্য যুক্তির অবতারণা নিয়ে লেখার পথিকৃৎ বলা যায়। সেখানে কৃষ্ণই নরনারায়ণ। আমরা বঙ্কিমের যুক্তিকে সর্বদা না মানতে পারলেও অগ্রাহ্য করতে পারি নি। ভারতীয় দূরদর্শনের প্রয়াস একরৈখিক এবং মহাভারতের যে একটা সর্বব্যাপী সুষমা ও সাহিত্যগৌরব আছে তা এখানে অনুপস্থিত। নবীনচন্দ্র সেনের রচনার কথা আগে উল্লেখ করেছি। কিন্তু আধুনিক স্কলারদের মধ্যে দুজনার লেখা ভালো লেগেছে—তাঁরা নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী (শারদীয় বর্তমান—দ্রৌপদী) এবং জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় (চতুরঙ্গ—মহাভারতের সত্যাসত্য)। তাঁদের দুটি লেখাই মন আকৃষ্ট করে। আরও আছে সুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ মহাশয়ের রচনা মহাভারতের সমাজ নিয়ে লেখা বিশেষ উপাদেয় একটি গ্রন্থ। এ ছাড়া মাঝে-মাঝে পত্রপত্রিকায় লেখক-লেখিকাদের কারো ভীমকে ভালো লাগে, কারো-বা দ্রৌপদীকে —এরকম লেখাও দেখতে পাই। এ সত্ত্বেও ইংরাজি কি বাঙ্গালায় এখনও বহু উপাদান রয়ে গেছে যা মহাভারত থেকে নিয়ে পাঠককে উপহার দেয়া যায়। তবে তার জন্য প্রচুর অধ্যয়ন ও সময় দরকার।

ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আগ্রহান্বিত করে ভারতে ৪৫০০-১৫০০ এবং তারপরে উপনিবিষ্ট প্রাগার্য-আর্য জাতির সংঘর্ষ-সমন্বয় কথাটা। কোন্ পথে তারা এসেছিল, কোন্ কোন্ বড়ো বা ছোটো অঙ্গরাজ্য তাদের করায়ত্ত বা করচ্যুত হয়, এর একটা সঠিক চিত্র ম্যাপের দ্বারা দেওয়াও সম্ভব। তাতে করে বর্তমানের ভূগোলের সঙ্গে একটা ভিন্নতর চিত্র পাওয়া সম্ভব। কোনো দেশে কোনো লোকের আসা মানেই হল, স্থায়ী লোকদের সঙ্গে একটা পরিচয়পর্ব—সেটা সবসময় মসৃণ পথে নাও হতে পারে। তার মধ্য দিয়ে বার হয়ে আসে নূতন কিছু ভাষা-শব্দ সাহিত্য সংস্কৃতি ও খাদ্যাখাদ্য। এগুলি নিখুঁত ভাবে পাবার উপায় নেই, কারণ যুগে-যুগের মানুষেরা লিপিকাররা অথবা আখরিয়ারা সব সময় খুব সততাসহ পৌর্বাপর্য রক্ষা করেন নি। নিজের কথাকে অপরের কথা বলে চালিয়েছেন। তাতে রচনা গৌরব সৌষ্ঠব হারিয়েছে, হারিয়েছে ইতিহাসের মূল উপাদানও। আশা করব, আমাদের সমসাময়িক কেউ এই ভৌগোলিক পদ্ধতি অনুসারে মহাভারতীয় দেশগুলির কথা বলতে পারবেন।

আমাকে দ্বিতীয়ত আগ্রহান্বিত করেছে এই দূর-বিস্তীর্ণ মহাভারতীয় কথার সঙ্গে একটা কোনো মূল জাতি (ইন্দো-ইয়োরোপীয় হিট্টি) কাহিনীও জড়িত আছে—জড়িয়ে গেছে তার সঙ্গে আশেপাশের অন্যান্য বহুশাখ ভিন্ন নৃকুল-নৃগোষ্ঠীর জনজীবনের সংযোগ-বিয়োগ। এইটাই মূলত মহাভারতীয় জনজীবনের ইতিহাস—প্রাকৃতজনার অবলুপ্তির পথে সেই ঘর্ঘর রথচক্র ধাবিত হয়েছে। অসংখ্য রকমের আচার-ব্যবহার-কুলাচার-দেশাচার, গোপনতা, নিয়োগপ্রথা শিশুহত্যা, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্যের অবাধ মিশ্রণ সহ ক্ষীণস্রোত বিবেক জাগৃতি—এও মহা-ভারতের একটা বড়ো দিক। সোসিও-অ্যানথ্রপলজি-ক্যাল পদ্ধতি অনুসারে মহাভারতের উপাদানগুলিকে আমরা এভাবে পুনর্বিন্যাস করতে যদি পারি, এও একটি বড়ো কাজ হতে পারে। মহাভারতে উক্ত আর্য

আর্যেতর এবং প্রাচীনতর সমাগত যাদব-ক্ষত্রিয় আর্য-দের নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয় নি। তবে আমরা মানি যে, মোহন-জো-দারো-হরপ্পায় প্রায় স্বীকৃত সব গোত্রেরই নুকরোটি পাওয়া গেছে। কৃষ্ণকুলও তাদের গোপালন-ঘোষযাত্রা ছেড়ে ক্রমেই নগর-সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। মহাভারতে কৃষ্ণের চাতুর্য সেই সত্যটাই প্রকট করে। এদিক দিয়ে কিছু সাইকো-সোশিওলজিক্যাল স্টাডিও হওয়া সম্ভব।

এসব প্রবণতা বাদ দিলে আমরা অনুভব করি—মহাভারত আমাদের এখনও আগ্রহান্বিত করে। মহা-ভারতের মানবচরিত্রগুলি মহাসাগরীয় তরঙ্গবিক্ষোভের মতো। কোথাও তা সুন্দর, কোথাও তা নিষ্ঠুর। এ বিষয়ে মহাভারত-রামায়ণে বর্বরতারই নিষ্ঠুর চিত্র আছে। দ্রোণের একলব্যের আঙুল কেটে নেওয়া এবং রামের শম্বুকহত্যাকে কোনো যুক্তিতে সমর্থন করা যায় না, তেমনই সমর্থন করা যায় না কুন্তীসমেত পঞ্চপাণ্ডবের দ্বারা নিষ্ঠুর একটি অনুষ্ঠান—সেটি হল খাইয়ে পরিতৃপ্ত করে শেষে জতুগৃহে সজ্ঞানে তাদের রেখে নিজেদের নিভৃত আত্মগোপন। সমগ্র মহা-ভারতে অনুষ্ঠেয় একপ্রকার স্বার্থযজ্ঞ ও চপলচিত্তের ব্যসনলীলা। তা না হলে মহামতি (?) যুধিষ্ঠির কেন পাশা খেলতে গিয়ে হিতাহিতজ্ঞান হারান এবং কেনই বা কপটদ্যূত বোঝার মতো বুদ্ধি তাঁর আচ্ছন্ন হয়? বর্ণ-বৈষম্য আছে এবং নেই দুইই। দ্রৌপদী অঙ্গরাজ কর্ণকে সূতপুত্র বলে বিবাহ করেন না। কিন্তু তিনি কর্ণেরও গুণমুগ্ধ ছিলেন। অর্জুনকে অধিক ভালোবাসার জন্য স্বর্গারোহণের পথে তাঁর মৃত্যু হয়। শেষ থাকেন এক যুধিষ্ঠির, সঙ্গে একটি সারমেয়। মনে না হয়ে পারে না যে দ্যূতক্রীড়াকালে তাঁর এই আশ্রিতবাৎসল্য ছিল কোন্‌খানে? সামগ্রিকভাবে মহা-ভারতের মানুষ বিবেক নিয়ে যেন উঠছে এবং পড়ছে। তার বিবেক জীবন্ত। রামায়ণের বিবেক স্থির অভ্যস্ত পথে চলে বলে সজীব মনে হয় না। প্রকৃত সাহিত্যিক রুচি-পরিশীলনের পথে এ গ্রন্থে প্রতিপদে মানুষ স্বার্থ নিয়ে বাঁচতে চাইছে—বাঁচতে গিয়ে অপরের স্বার্থে আঘাত করছে ও আঘাত পাচ্ছে। কিন্তু অন্তর্নিহিত বিবেকদংশন মানব-নিয়তির মতো তাকে অনুসরণ করে চলেছে। মহাভারতের আদিমত্ব প্রাচীনত্ব সহ তার এই আধুনিকত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তবে মহাভারত নিশ্চয়ই রেফারেন্স বুক নয়—ধর্মপুস্তকও নয়—যে তার থেকে আমরা বিশেষ নির্দেশ পেতে পারি। বরঞ্চ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-সহ মহাভারত একই সঙ্গে বহু পথ স্মরণ করায়—বিভিন্ন অধিকারীকে চিহ্নিত করে।



## সময়ের বাইরে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ঘড়ি ছড়িয়ে দিয়েছি আকাশে, এখন
আকাশই বাজাক ঘণ্টা
নক্ষত্রে বসাক তার শব্দের স্থূল।
আমি তো সময়হীন
তাই চুপচাপ জানলা খুলে
নিচ থেকে দেখে যাব নিসর্গমশকরা!

ভোরের অনেক আগে গাছ থেকে নেমে
এসেছিল ঝরাপাতা,
সে কি শুধু বাউলের বৈতানিক পায়ে
ধ্বনির রহস্য তুলে ধরবে বলে?
একদিন বনতোষিণী সময়ে
আমিও ছিলাম পদচিহ্নের সাহসী!
পাখিদের আকাশপ্রস্তাব
সে সময় বস্তুত বুঝেছি সব, আর
কবিতাকে ঘুড়ি করে পাঠিয়েছি
শূন্যতার সংকেত উদ্ধারে,
পাঠিয়েছি কাগজে বসাব বলে
চুরি করে আনতে কিছু ইন্দ্রসম্পদ,
সুতোছেঁড়া সেসব কাগজ
একদিন ফিরে এসে
কি অবাক শুয়ে রইল একলা মাটিতে!
যেন কারো পায়ের ছাপের অবহেলা
বুকে তার চাই-ই।

আজ আমি সময় ছাড়াই
ছেড়েছি দুঃখের স্থূল,
সুখের সমস্ত হোমটাস্ক
কাগজের নৌকা করে
কাছের নদীতে ছেড়ে দিতে দিতে
বলেছি আমাকে কথা দাও
সমুদ্রে পৌঁছনোর আগে কিছুতে ডুববে না।
আমার আকাশে
সূর্যে, পঞ্চমীর চাঁদে

যেসব অম্লান প্ররোচনা
নিঃশব্দে করেছে সব ইচ্ছাকে তছনছ,
তারা সব ব্যর্থ বুড়ো
একচোখেও আজ আর দেখে না প্রণয়!

যতই বাজাক ঘণ্টা নীলাকাশ,
এখন যে দুকানই বধির!





## স্বভাবজ

কিরণশঙ্কর মৈত্র

ক্যানভাসে লাগে নি দাগ—আশুভ্র নিঃশব্দ
ইজেলে রঙ ছিল সাত হাজার, তুলিকা
নিষ্কলঙ্ক স্বর্গের কিশোর, আকাশেও
মেঘ ছিল না—থাকুক না এনামেল রঙ।

অনিবার্য আবির্ভাব—অমর্ত্য রূপবতী কণ্ঠে
কিন্নরী-মায়া, মানস-সরোবর থেকে আহৃত
স্বর্ণ শতদল, বাতাস বয়ে আনে পরজ
বসন্তের সুর, শুরু মালব-কৌশিকী কার্নিভাল।

যতই মন্দির গড়ি প্রতিমায় আলোকিত
ভাঙে অতিকায় অশাত ডানা, অনয় ঈগল
উচ্চকিত, ঝড় বিষম গতি, ঝঞ্ঝাবাত
নেমে আসে—পর্বত-প্রহার নির্মম কঠিন।

দেখেছ কি কুসুম-বাগানে শ্মশান?
রজনীগন্ধার মুখে বিধবার বিষাদী হাসি?
যে-নদী পার হয়ে আস প্রতিদিন
আগুনে পুড়েছে জল, ক্ষতচিহ্ন বুকে তার।

মেঘমায়া পরাবে না চোখের কাজল দিব্যনারী
বৃষ্টি ঝরাবে এবার বিষাতি ধারা অবিরল—ঝরাক,
অধর ছুঁয়েছে মধুকোষ অমৃতের স্বাদ, সে
নিয়ে যাবে এ-জীবন সুখাবতী হেমকূট।

## চৌরঙ্গি থেকে ব্রাডফোর্ড

জয়শ্রী গুপ্ত

চৌরঙ্গির কুয়াশা যেন বেড়াতে এসেছে এই
ব্রাডফোর্ডের গোলাপি মেপলে—সঙ্গে
গঙ্গানগরীর ধুলোধোঁয়ামাখা ভালোবাসা!
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক উপান্তে এই
মেঘলা বিকালে আমি গোলাপপ্রস্তাব হাতে একাকী দাঁড়িয়ে আছি
সামনে কীটসের এপিটাফকীর্ণ সাদা বিখ্যাত পাথর!
কাছেই উইনডি নদী; নিসর্গের শান্ত পুরোহিত
ওয়ার্ডসওয়ার্থ এ নদীতেই বহুবার দেখেছেন তাঁর শব্দেভেজা
বিস্মিত বয়ান; সন্ধ্যায় নীলাকাশের ভাষা নিয়ে
পাখিদের ফিরতে দেখেছেন।
আমারও প্রবাসী চোখ ক্রমশই ছন্দ হয়ে আসে।
আমিও শব্দের মতো ইয়র্কের এই প্রাচীন শহরে
যেন হয়ে যাই কোনো কালিদাস-মেঘের দুহিতা
যে নাকি হঠাৎ পেয়েছে খুঁজে মেঘমাশ্লিষ্ট কুয়াশাসংকেতে
দশজন্ম পরের কোনো সুখসাধা চুল-ছড়ানো দিন।

তবু এইসব মুখ, এই কবিতামুখর ভালোলাগা
একদিন অস্থির পাথর হয়ে টুপ ডুবে যাবে কোনো নদীর নিয়মে,
ব্রাডফোর্ডে যে কবর কবি
সে আর ফিরবে না কোনো অমূলক নারীর শ্মশানে।





## জন্ম

রফিক উল ইসলাম

ক্রীতদাসী আজ ওষধি খুঁড়েছে
পাঁক ফুঁড়ে জন্ম নেব এবার,
গুহার কবচকুণ্ডল ধুনি ও প্রলাপ
অতিথিরা ভাগ করে নাও।
আয়নায় এত আলো এত প্রসন্নতা
ঘোর ভেঙে যায়—
অবসাদ বেয়ে খসে পড়ি লালনের গানে,
দুলে ওঠে লাজুকলতার দোলনা
দুলে ওঠে নাটমন্দিরের চূড়া।

ক্রীতদাস গেছে কাঠ কাটতে বনে,
ফিরে এলে তার আগুনে পোড়াব
নাড়িভুঁড়ির রক্তের ছোপ।
এখনো স্রাবের ভেতর ডুবে আছে পা,
মুঠো থেকে পদ্মরাগমণি
গড়িয়ে যাচ্ছে কালপুরুষের ঋণে!
আদিম কুয়াশার নিচে বলিকাঠ ঘিরে নাচে পড়শিরা—
ওই ভেসে আসে মাথা, ভেসে আসে বুক···পেট···
ভাঙা শরীর জুড়ে-জুড়ে হিজড়ের গানে
ক্রীতদাস বোঝা ফেলে;
তখনই আঁতুড়ঘরে নরম গোড়ালির ভারে
বলিকাঠের সৌধ ভেঙে যায়।

# সোনালি ডানার চিল

কৌন্তেয় গঙ্গোপাধ্যায়

অনাদিবাবু পড়ে গেলেন। হঠাৎই। ট্রেন থেকে নেমে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ালেন। দু-এক পা হাঁটলেন। আবার থামলেন। তারপর পড়ে গেলেন। ওভারব্রিজের সিঁড়ির থেকে সামান্য দূরে।

জনা তিন-চারেক লোক দৌড়ে এল। সবাই প্রায় অফিসফেরতা। পেছন-পেছন আসছিল। এগিয়ে এল ইতস্তত-ছড়িয়ে-থাকা কয়েকজন। ভিড় বাড়ল। একজন বুদ্ধি করে একটা খুরিতে কলের জল নিয়ে এল।

চোখ খুলেই ভীষণ অপ্রস্তুত লাগল নিজেকে। চারপাশে, ঘাড়ের ওপর, মুখের ওপর, অনেকগুলো মুখচোখ ওঠানামা করছে। টুকরো-টুকরো নানা কথা। অনাদিবাবুর কানে একটাও ঢুকল না। উঠে বসলেন। একজন কাঁধটা ধরে আছে। সে-ই হাত বাড়িয়ে চশমাটা এগিয়ে দিল।

—কাঁচে জল পড়ত কিনা, তাই খুলে রেখেছিলাম।

চশমা লাগিয়ে ধাতস্থ হতে অনাদিবাবু সামান্য সময় নিলেন। ডান হাতের উলটো পিঠ দিয়ে কপাল মুছলেন। ঘাম আর জল একসঙ্গে উঠে এল। বসে-বসেই বুঝতে পারলেন বড়ো-বড়ো শ্বাস পড়ছে।

—ঠিক আছেন?

অনাদিবাবু প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালেন না। অপ্রস্তুতভাব কাটে নি এখনও।

—হ্যাঁ, ঠিক আছি, ধন্যবাদ।

ধীরে-ধীরে কথাগুলো বললেন অনাদিবাবু। তারপর অদেখা সাহায্যকারীর ডান কাঁধে সামান্য ভর দিয়ে উঠলেন।

ভিড় পাতলা হল।

—আপনার ব্যাগ।

চশমা খুলে সামান্য ঝুঁকে পানজাবির গায়ে সেটা মুছে নিয়ে আবার পরলেন।

—ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা ধরলেন।

—ওপারে যাবেন তো?





—না, ঠিক আছে, এবার যেতে পারব।

অযাচিত সাহায্যলাভের মাত্রা বাড়ার আশঙ্কায় অনাদিবাবু নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। কুণ্ঠার একটা স্বর যে স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর গলায়, এটা তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন।

অনাদিবাবু ওভারব্রিজের সিঁড়ি ভাঙলেন খুব আস্তে-আস্তে। বাঁ হাত দিয়ে রেলিঙ ধরে-ধরে। উপরে উঠে আবার একটু দাঁড়ালেন। নীচে তাকালেন। ওই সিমেনট-বাঁধানো বসার জায়গাটার ধারে উনি পড়ে গিয়েছিলেন। প্ল্যাটফর্মের ছায়া ওখানে শেষ হয়েছে। একটা পাঁউরুটির টুকরো পড়ে। আপাতত একটা কাক তাই নিয়ে ব্যস্ত।

শরীরটা হঠাৎ কীরকম যেন করে উঠেছিল। কেমন একটা খালি হয়ে যাওয়া, যেন কেউ পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে বুক পেট থেকে বের করে নিল সবকিছু।

যেরকমভাবে উঠেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই উনি নামলেন আস্তে-আস্তে।

স্টেশনের গেট পেরিয়ে কয়েক সিঁড়ি নেমে রিকশা স্ট্যানড। এমনিতে রোজ হেঁটে যান। বাজার সারতে-সারতে। মিনিট পনেরোর পথ বড়ো জোর।

আজ ভরসা হল না।

—জোড়ামন্দির।

রিকশার সীটের পেছনে নিজেকে অনেকটা হেলিয়ে দিলেন অনাদিবাবু। ব্যাগটা প্রথমে আলগোছে কোলে রাখলেন। ভারি মনে হল। পাশে নামিয়ে রাখলেন তারপর।

স্টেশনের গায়ে লাগানো বাজার। মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। খোয়ায় ভর্তি সমস্তটাই। এখনও পিচ পড়ে নি। রোজই শোনা যাচ্ছে সামনের মাসে পড়বে। এই রাস্তা দিয়েই যাবতীয় রিকশা, সাইকেল-ভ্যান, মোটরগাড়ি, এমনকী বাসও যাওয়া-আসা করে। প্রাইভেট বাসের একটা টার্মিনাস এখানেই।

ঠিক মনে পড়ছে না, তবে প্রায় উনিশ বছর বাদে এই রাস্তার ওপর রিকশায় চড়লেন অনাদিবাবু। প্রথমবার চড়েছিলেন সেই যখন এখানে এলেন পাকাপাকিভাবে। তখন প্রথম-প্রথম বলেই বোধ হয় স্টেশন থেকে বাড়ির দূরত্ব ঠিক আন্দাজ করতে পারতেন না। মনে হত সব রাস্তাই আমহার্স্ট স্ট্রীটের পুরোনো পাড়ার মতো হয় না কেন। ছোটো-ছোটো গলি। চার পা হাঁটলেই বড়ো রাস্তা। দোকানপাট।

তবুও ভাড়াবাড়ি। আর মমতা। একরকম ওর জন্যই শেষমেশ বাড়িটা তোলা গেল। জমি পাওয়া গিয়েছিল মমতারই সম্পর্কের এক দাদার সাহায্যে। তারপর জমানো টাকা, মমতার গয়না আর ধার।

বাজার শেষ হতেই অনাদিবাবু ঠাণ্ডা হাওয়ার রেশটুকু বুঝতে পারলেন। এদিকে একটু বেশি ঘিনজি বাড়িগুলো। স্টেশন বাজার কাছে বলেই। যদিও ভিড় আর চেঁচামেচি অনেক পাতলা হয়ে এসেছে।

বাজারটা সেরে যাওয়া যেত। তা না হলে আবার সেই সকালে ছুটোছুটি। অনাদিবাবু ভাবলেন। যদিও জোর করে ভাবলেন না। সামান্য শরীর ছেড়ে দিয়ে একটু কাত হয়ে ঠেশ দিলেন। ঝাঁকুনি এতক্ষণে গা-সওয়া হয়ে গেছে।

রিকশাওয়ালা ছেলেটা একটা হিন্দি গানের সুর ভাঁজছে। গতবারের পুজোয় গানটা খুব চলেছিল। ছেলেটা একটা ক্যাটক্যাটে লাল গেনজি পরে। কানের উপর দিয়ে এনে পেছনে চুল ফোলানো। হাঁটুর ওপর গোটানো নীল লুঙ্গি। ও সীটের ওপর বসেই চালাচ্ছে। আস্তে-আস্তে। সবাই যেরকম উঠে-উঠে, দুলে-দুলে চালায়, সেভাবে নয়। ওর এই অলস ভাবটা অনাদিবাবুকেও যেন একটা বাড়তি আরাম এনে দিল।

ডানপাশে কাঠগোলা। গণেশ স মিল। বড়ো দরজার পাশে লম্বা-লম্বা বীমগুলো রাখা। লালচে খয়েরি। ভেতর থেকে কাঠচেরাইয়ের একটানা শব্দ রাস্তার উপর থেকে শোনা যাচ্ছে।

কাঠগোলা ছাড়তেই কোটাপুকুর। এদিকে

বাড়িগুলো দূরে-দূরে। ফাঁকা-ফাঁকা। পুকুরটা বেশ বড়ো। এখানে যে কটা পুজো হয়, সব কটার ভাসান কোটাপুকুরেই। সবুজ কালো জলের পানা গন্ধ। ঘাট ফাঁকা। একটা বউ শুধু জলে নেমে ঘাটের ওপর উঁচু হয়ে বাসন মাজছে। অনাদিবাবু জোরে একটা নিঃশ্বাস নিলেন।

মমতা নিশ্চয়ই বিকেলের উনুন ধরিয়ে দিয়েছে এতক্ষণে। ঘরে কাঁচা বাজার বলতে কিছুই নেই। রেগে যেতে পারে। বিচিত্র নয়। গতকাল রাত্রে ওর টানটা বেড়েছিল। ঠিকভাবে ঘুমোতেও পারে নি।

রুমি বোধ হয় এতক্ষণে ফিরে এসেছে। মমতা বলেছিল কাছেপিঠেই কোথাও একটা ভরতি হয়ে যেতে। অনাদিবাবু শোনেন নি। পড়লে ভালো জায়গায় পড়াই ভালো।

অবশ্য অনাদিবাবুর সঙ্গে রুমির কথা হয় কম। মমতার সঙ্গেও যে খুব একটা বেশি কিছু তাও নয়। এমনিতেই ও খানিকটা চুপচাপ। বই নিয়ে বসে থাকে। মাঝেমধ্যে টুকিটাকি ঘরের কাজ। মমতা রেগে যায়—বই মুখে নিয়ে বসে থাকলেই হবে? অনাদিবাবু থামিয়ে দেন।

অনিন্দ্য কখনও-কখনও আসে। রুমিদেরই কলেজে পড়ে। হস্টেলে থাকে। সামান্য কলরব যা হয়, তখনই। রুমি সেদিন বলছিল ওরা দুজনে নাকি একটা পত্রিকা শুরু করবে। মমতার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করে অনিন্দ্য। অনাদিবাবুর সঙ্গে অবশ্য কিছু মামুলি কথা ছাড়া আর বিশেষ কিছু হয় না।

বটগাছের নীচে শানবাঁধানো বেদীর ওপর ছুটো মন্দির। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ছোটোদের টানা ছুটো রথ এনে পাশাপাশি বসিয়ে দিয়েছে কেউ। এইটুকু ব্যাপারকে মন্দির বলা যেতে পারে কিনা সেটা অবশ্য কথা হিসেবে ওঠে নি কখনও। শনি-মঙ্গলবার পুজো হয়। ভিড়ও হয় বেশ।

রিকশাওয়ালাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যেতে বললেন অনাদিবাবু। জোড়ামন্দির বাঁদিকে ফেলে রিকশা ঘুরল। এদিকে গোটাতিনেক বাড়ি। মাঝ-খানে অনেকটা করে ফাঁকা জমি। একটা আবার পাঁচিল তুলে সদ্য ঘিরে রাখা হয়েছে।

অনাদিবাবুর বাড়ি প্রথমেই। সামনের ফাঁকা জমিতে বাগান করেছেন। ছোটোর মধ্যে। রজনীগন্ধা, জবা—এইসব আর কী। ছুটো লঙ্কার ঝাড়। গত সপ্তাহে একটা পেঁপের চারা লাগিয়েছেন।

রিকশা ঘুরতেই অনাদিবাবু দেখতে পেলেন রুমিকে। দরজায় দাঁড়িয়ে। কিছুটা এগিয়ে এল ও।

রিকশায় বসেই উনি ভাড়া মেটালেন। তারপর ডান হাতে ব্যাগ চেপে, রিকশাওয়ালার সীটে ভর দিয়ে নামলেন। আস্তে-আস্তে।

—কী হয়েছে, রিকশায় এলে যে? শরীর খারাপ?

রুমি আরেকটু এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা ধরল। অনাদিবাবু হাসলেন।

—তুই কখন ফিরলি?

—তাড়াতাড়ি। আজ ক্লাস হয়ই নি প্রায়।

রুমি বাগানের দরজা বন্ধ করল। অনাদিবাবু ঘরের দিকে এগোলেন।

—মা কী করছে রে?

—একটু আগে তো ছাদে উনুন ধরাচ্ছিল। এখন বোধহয় রান্নাঘরে। ডাকব?

—না, থাক।

গত দেড়বছর ধরেই অনাদিবাবু এই বাইরের ঘরেই থাকেন শোন। একা। মমতাকে সিদ্ধান্তটা প্রথমে জানাতে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। এখন দুজনেই অভ্যস্ত।

জানলার মুখোমুখি ইজিচেয়ার। ধুলোলাগানো ধুতি-পানজাবি শুদ্ধুই উনি গা ছেড়ে দিলেন। ব্যাগ-চশমা বিছানায়। চোখ বন্ধ করে রইলেন। কপালের ছুদিকে দপদপ করছে।

—বাবা, জল।

এই ছুটো কথা বলার আগে রুমি যে কয়েক মুহূর্ত মন দিয়ে লক্ষ করছিল, এটা উনি চোখ খুলেই







বুঝতে পারলেন।

—পরদাটা তুলে দে তো।

এক নিঃশ্বাসে জল খেয়ে উনি আবার হেলিয়ে দিলেন নিজেকে। কদিন হল মমতা নতুন পরদা লাগিয়েছে। সুন্দর নকশা। কাপড় জুড়ে বাহারি পাতা ছড়ানো।

রুমি জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ছুহাতে পরদা সঠিকভাবে ভাঁজ করে জানলার গ্রিল আর তারের মাঝখানে গুঁজে দিচ্ছে। ও সামান্য কাজের মধ্যেও একটা সুচারু ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে জানে। ছোটোবেলা থেকেই। একেক সময় ওকে বড্ড বেশি পরিশীলিত মনে হত। মনে হয়ও। অবশ্য বলেন না কিছু এ নিয়ে। কিন্তু এখন ওর দিকে তাকিয়ে, নিখুঁতভাবে ওর এইটুকুনি কাজ করা দেখতে-দেখতে অনাদিবাবু বুঝতে পারলেন, ভালো লাগছে।

রুমি আজ শাড়ি পরেছে। ঘরে খুব কমই ও শাড়ি পরে। শাড়িটা মমতার। একটা সাধারণ হাত ধোঁপা করেছে। আলগা হয়ে সেটা ঘাড়ের কাছে।

—অনিন্দ্য আসবে?

জিজ্ঞাসা করেই অনাদিবাবুর মনে হল এই প্রশ্ন উনি আগে কখনও রুমিকে করেন নি। ভাবেনও নি। কেন তবে জিজ্ঞাসা করলেন? প্রশ্নটার মধ্যে ঔৎসুক্যমেশানো কোনো ভাব কি বোঝা যাচ্ছে? রুমি কি কিছু মনে করবে? অনাদিবাবু কয়েকবার মনে-মনে প্রশ্নটা আওড়ে নিলেন। কানে কিভাবে বাজছে বোঝার জন্য।

—বলেছিল তো।

রুমি জানলা থেকে সরে এল।

—জামাকাপড় ছাড়বে না?

—এই ছাড়ছি। মা কি চা বসিয়েছে?

অনাদিবাবু ওঠার ভান করলেন। যদিও উনি জানেন এখন উঠবেন না। ভালো লাগছে না এক্ষুনি জামাকাপড় ছাড়তে।

—দেখছি।

রুমি বিছানা থেকে ব্যাগ, চশমার খাপ তুলে নিল। টিফিন-কৌটো বের করল।

—খাও নি?

—ইচ্ছে করছিল না।

দরজার পাশে একটা ছোটো ওয়ার্ডরোব। তার উপর ব্যাগ রেখে চশমার খাপ টেবলে রাখল রুমি। তারপর টিফিন-কৌটোটা নিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে অনাদিবাবু জানলার বাইরে তাকালেন। এখন বেলা বড়ো। মরা রোদ বাগানে। একবার জল দেওয়া দরকার। রুমিকে বললে হয়। কিন্তু ডাকলেন না। শুয়ে রইলেন ওইভাবেই।

রজনীগন্ধাগুলো কীরকম শুকনো দেখাচ্ছে। ক্লান্ত। ফ্যাকাশে। ঠিক তার পাশেই অদ্ভুতভাবে বেমানান জবার ঝাড়গুলো। মোটা-মোটা বেসুরো ডাল। গাঢ় সবুজ পাতার ফাঁকে-ফাঁকে নিশ্চুপ কুঁড়িগুলো ফোটার অপেক্ষায়। আর কিছু নয়নতারা। অনেক অনেক পাতার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ-হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে। নরম বেগুনি লাল। ছোটো-ছোটো।

অনাদিবাবুর মনে হল সমস্ত জমি জুড়ে একটা বেহিসেবি হাতের কাজ বড়ো বেশি স্পষ্ট। একবার তাকালেই বোঝা যায়। তবু ভালো লাগছে তাকিয়ে থাকতে। যেন এই অগোছালো-পনাটুকুই ঠিক আছে। তাঁর পক্ষে। একেবারে মানানসই। কোনো কারণ নেই। তাগিদ নেই। মন দিয়ে করা নয় বলেই পারিপাট্য আসে নি। আর সেইজন্যই ভালো লাগছে। ছোটোবেলায় বিকেলে খেলতে না গিয়ে হোমটাস্কে দেওয়া রচনা লেখার মতো। খেলা ব্যাপারটা আসত না বলেই লিখতে বসা। যদিও সেটা পরের দিন ক্লাসে কখনোই আহামরি বলে গণ্য হবে না, সেটা জানতেন। তবু লেখা। 'একটি বটগাছের আত্মকথা' বা 'আদর্শ মহাপুরুষ', বা 'একটি বর্ষার দিনের অভিজ্ঞতা' বা 'গ্রামের মেলা'। বছর শেষ হলেও খাতাগুলো রেখে

দিতেন। মাঝে-মাঝে, শীতের কোনো দুপুরে ছাদের কোণে গিয়ে বসতেন ময়লা হয়ে-যাওয়া ব্রাউন পেপারের মলাট দেওয়া খাতা কটা নিয়ে। উঠোন পেরোলেই রেল লাইন। হঠাৎ চলে যেত কোনো ইলেকট্রিক ট্রেন তীরের মতো বাতাস কেটে। কখনো বা অনেক সময় ধরে হাই তুলতে-তুলতে মালগাড়ি। রেল লাইনের ধারে মেয়ে-বউরা ঘুঁটে দিতে আসত। কিংবা ঘাস কেটে বোঁচকা বাঁধত। কোলের উপর রচনাখাতার পাতাগুলো উড়ত। উনি তাকিয়ে থাকতেন।

—অন্ধকারে বসে আছ, আলো জ্বাল নি কেন?

চায়ের কাপ নিয়ে মমতা ঘরে ঢুকল। আলো জ্বালল। ওর বিকেলের গা ধোয়া হয়ে গেছে। চুল-বাঁধাও।

—জামাকাপড়ও ছাড় নি। খুব ক্লান্ত? রুমি বলছিল শরীর খারাপ-খারাপ লাগছে।

টুল টেনে নিয়ে তার উপর চায়ের কাপ রাখল মমতা।

—হুঁ, তা একটু লাগছিল। বিশ্রাম নিচ্ছিলাম।

—কী রকম লাগছিল?

মমতা নিজেকে শান্ত রাখল।

—কিছুই না, এমনিই একটু খারাপ লাগছিল।

অনাদিবাবু উঠে পানজাবি ছাড়লেন। দেওয়ালের হ্যাঙ্গারে টানিয়ে এসে বসলেন। মমতা চুপ করে বসে আছে। বুঝতে পারলেন অসন্তুষ্ট। আঁচ করার চেষ্টা করলেন কী-কী বলতে পারে, কিছুদিন বিশ্রাম নাও, ডাক্তার দেখাও। কিংবা অসন্তোষের মাত্রা যদি বেড়ে গিয়ে থাকে, যা ভালো বোঝ করো।

কিন্তু মমতা এর কোনোটাই বলল না।

—হাতমুখ ধুয়ে এসো। খাবার আনছি।

—এখনই খেতে ইচ্ছে করছে না। পরে খাব।

ডান হাত মুড়ে অনাদিবাবু মাথার ওপর রাখলেন।

—কিছু কাজ আছে এখন?

জানলার দিকে তাকিয়ে অনাদিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন। সামান্য কেশে ডান হাতটা কোলের উপর নামিয়ে আনলেন। তারপর তাকালেন মমতার দিকে।

—ভাতের জল বসিয়ে এসেছি।

—ও।

অনাদিবাবু উঠে বসে টুলের উপর থেকে চায়ের কাপ তুলে নিলেন। চুমুক দিতে লাগলেন আস্তে-আস্তে।

—কেন, কিছু বলতে?

মমতা টেবলের কাছে দাঁড়িয়ে। রুমি যেখানে চশমার খাপটা রেখেছিল, সেখান থেকে তুলে ভাঁজ-করা খবরের কাগজের উপর রাখল।

—বসতে বলতাম।

চায়ের কাপের দিকেই তাকিয়ে রইলেন অনাদিবাবু। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ। মমতা এগিয়ে গেল।

—আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যেও।

অনাদিবাবু চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন।

মমতার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কোনো প্রসঙ্গ ধরে নয়। এলোমেলো। হয়তো তাও নয়। ও শুধু একটু এসে বসুক। অনাদিবাবুর মনে হল অনেক দিন বাদে খুব সহজভাবে কিছু একটা বললেন মমতাকে।

কিন্তু ও চলে গেল কেন?

বাইরে সন্ধে। অন্ধকার ঘরে তার নীলচে আভা। ঠিক এরকম তিনি আগে কখনো দেখেছেন বলে মনে পড়ল না। রোজই মনে হত হঠাৎ সন্ধে নামল। বাজারের থলেটা রান্নাঘরের সামনে নামিয়ে মমতাকে বাজারদরের ফিরিস্তি দিতে-দিতে কিংবা গা ধুতে-ধুতে কিংবা ছাদে মাদুর বালিশ পেতে বসতে-বসতে দেখতেন সন্ধে নেমে গেছে। সন্ধে আসার কথা বোঝাতে সবাই কেমন 'নেমে এল' ব্যবহার করে, অন্তত রচনা খাতায় বা গল্প-উপন্যাসে। অনাদিবাবু হাসলেন। সত্যিই কি সন্ধে 'নামে'? কোথার থেকে? সূর্যের পেছন থেকে? আকাশের আড়াল থেকে? হঠাৎ-এসে-যাওয়া এই ভাবনাটার এবার







পুরোপুরি লাগাম ছেড়ে দিলেন অনাদিবাবু। একটা অন্যরকম স্বাদ। যেখান থেকেই নামুক না কেন, সন্ধে আসে। সন্ধে হয়। এই যেমন এখন তুলতুলে নীল সন্ধের আলো জানলা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। এটা অনাদিবাবু আগে কখনো দেখেন নি। বা যখন দেখেছেন একরাশ কালোয় সন্ধেটা আর আলাদা করে দেখা যেত না। অথচ এখন গলে-যাওয়া তুল-তুলে আলোর ভেতর থেকে আলাদা করে সন্ধে বেরিয়ে আসছে। ছোটোবেলায় মণ্ডলদের ভাঙা পাঁচিলে বসে ফলসা খাওয়ার মতো। মুখে দিলেই নরম মিষ্টি শাঁসগুলো কী তাড়াতাড়ি গলে যেত। আর বিচিগুলো জমা হত গালের পাশে।

হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ তুললেন অনাদিবাবু। জুড়িয়ে গেছে। বিস্বাদ। নামিয়ে রাখলেন। আঁচলে মুখ মুছতে-মুছতে মমতা ঢুকল। ইজিচেয়ারের পাশে চৌকির কোণ ঘেঁসে বসল।

অন্ধকারে মমতার দিকে তাকালেন অনাদিবাবু। কিরকম আলুথালু হয়ে বসে। মনে হল মমতা অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে থেকেও বুঝতে পারছে উনি ওর দিকে তাকিয়ে।

ও নিজের থেকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করছে না কেন, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে যেমন করে থাকে, নাকি শুধু বসবে বলেই এসে বসেছে?

একুশ বাইশ বছর আগে অখিল মিস্ত্রি লেন দিয়ে এই সময় 'কুলপি কুলপি' ডাক দিতে-দিতে একটা লোক যেত। লাল-কাপড়-মোড়া হাঁড়ি মাথায়। আর হাতে বেলফুলের মালা ঝুলিয়ে এক বৃদ্ধ।

—কালকের বাজার তো কিছুই আনতে পারলাম না। সবজিপাতি আছে কিছু? আচ্ছা, সকালেই না হয় কিছুটা তাড়াতাড়ি করে—

অনেকগুলো কথা তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে নিজেকে থামিয়ে দিলেন অনাদিবাবু। যেন কিছু একটা বলার দরকার ছিল। অন্তত শুরু করার মতো কিছু যা হোক। কিন্তু প্রয়োজন ছিল কি? —কারণ এটা তো মমতাও জানে যে উনি আজ বাজার করতে পারেন নি আর কাল সকালেও সম্ভব হবে না। আটটার মধ্যে রোজ বেরোতে হয়। কিন্তু এ ছাড়া আর কীই বা বলতে পারতেন—সেই মুহূর্তে মনে হওয়া বেলফুলের মালার কথা? হাঃ! মনে-মনে এই একশব্দযুক্ত বিশেষ ধ্বনি আওড়ানো ছাড়া আর কিছুই করা গেল না। কোনো-কোনো ভাবনা মুখ ফুটে বলতেও বোধ হয় অভ্যাসের প্রয়োজন হয়।

আরো খানিক সময় গেল। তুলতুলে নীল মিলিয়ে গিয়ে ফ্যাকাশে ছাইরঙা অন্ধকার। বারান্দার থেকে একচিলতে আলো এসে পড়ে জমাট কালোটাকে খানিক ঘোলাটে করে দিয়েছে।

—অনিন্দ্য এসেছে।

অনাদিবাবুর পরপর এতগুলো কথাকে অনেক পেছনে ফেলে, যেন সেগুলোর অর্থহীনতা আর বড়ো-বড়ো ফাঁকগুলো ধরে ফেলেছে এই রকমভাবে, বিজয়ার পরে দেখা করতে আসা কোনো স্বজনের কুশল জিজ্ঞাসা করার মতো নির্লিপ্ত আর নির্ভার ভঙ্গিতে এই দুটো শব্দ মমতার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

—কখন?

নিতান্তই সাড়া দেওয়ার জন্য, যান্ত্রিকভাবে একটিমাত্র শব্দ ব্যয় করে অনাদিবাবু ইজিচেয়ারে এলিয়ে দিলেন নিজেকে।

—এই মিনিট দশেক আগে।

অনাদিবাবুর চোখ বন্ধই রইল।

ছাদের পাঁচিলে সারাদিনের রোদের তাত এখনও কাটে নি। একটা গরম-গরম ভাব। কনুয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াতে অনিন্দ্য সেটা টের পেল। চারদিকে গোটা কয়েক বাড়ি নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে। যেন ঘিরে-থাকা আলো-অন্ধকারটুকু ছাড়া সহায়সম্বল-

হীন। বড়ো রাস্তার আলো এদিকে এতটা অবধি এসে পৌছায় না। নীচে অস্পষ্ট বাগান। ও একটা ইটের কুচি নিয়ে সিমেন্ট না-লাগানো পাঁচিলের উপর ঘষতে লাগল।

তারপর রুমির দিকে ঘুরল।

ছাদের ঠিক মাঝখানে মাদুর পেতে রুমি বসে। বুকের কাছে মুড়ে-আনা হাঁটুর ওপর মাথা। অনিন্দ্য এসে ওর আসনে বসল। রুমি মুখ তুলল। অল্প হাসল। কোনো কথা বলল না অনিন্দ্য। হাসল না। সামান্য সরে এসে আলতোভাবে ওর বুকে মাথা ছোঁয়াল। সংযত লয়ে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। কেমন করে ওর হৃৎপিণ্ডটা একইভাবে বাজে, অনিন্দ্য ভাবল। ওর কোনো উত্তেজনা নেই, যেমন অনিন্দ্যর ভেতরে এখন হচ্ছে? ও আগে কখনও রুমিকে এভাবে ছোঁয় নি। একমুহূর্ত আগেও মনে হয় নি ও এভাবে রুমিকে ছুঁতে পারবে। অনিন্দ্যর মনে হল নরওয়ের যুদ্ধদেবতা থরের হাতুড়িটা বড্ড বেশি বড়ো। আর ভারি। যেটা ওর বুকে এখন বাজছে। যেটা ওর বুকটাকে এই মুহূর্তে চৌচির করে দেবে। ওর চুলের ওপর রুমির নিঃশ্বাস। রুমি কি ওকে দেখছে? অনিন্দ্য মাথা তুলল।

—রুমি!

ওর আঁচলটা অনিন্দ্যর হাতের চাপে কোলের কাছে সামান্য গুটিয়ে এসেছে। রুমি সেদিকে তাকাল না। অনিন্দ্য একটা চাপা অস্বস্তি বোধ করল। ও কি 'সুযোগ' নিল একটি পরিবারের সহৃদয়তা, ভালোবাসা এই নিরুপদ্রুত ছাদ আর শান্ত অন্ধকারের? উপর দিকে চাইল। খোলা আকাশে জ্বলজ্বলে তারাগুলো অজস্র গুটিবসন্তের মতো দেখাচ্ছে। সবকিছুকে ভীষণ ঘৃণা করতে ইচ্ছে হল অনিন্দ্যর।

রুমি ওর দিকে তাকিয়ে।

—শুভজিৎ কিছু টাকার বন্দোবস্ত করে দেবে বলেছে। একটা বিজ্ঞাপনের খোঁজ দিয়েছে। এই সপ্তাহে খানিক ছুটোছুটি আছে বুঝতে পারছি।

অনিন্দ্য জোর করে সদ্যোজাত ঘৃণাটা বোজানোর চেষ্টা করল।

—তুমি সত্যি-সত্যিই উঠেপড়ে লেগেছ দেখছি।

রুমি সামান্য হাসল।

—কেন, তোমার ইচ্ছে নেই?

—আমি কি তা বলছি?

হাতে ধরা ইটের কুচিটা ক্ষয়ে-ক্ষয়ে মিলিয়ে গেছে পাঁচিলে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতেই। আঙুলের উপর শুধু কিছু গুঁড়ো লেগে। মাদুরে সেটুকু মুছে নিল অনিন্দ্য।

—তবে?

রুমি মুখ ফিরিয়ে হাঁটুর ওপর থুতনি রাখল।

—আমি শুধু বলতে চাইছিলাম কী হবে এইসব করে? কত অজস্র কাগজ আর ম্যাগাজিন বলো তো এখন? তোমার-আমারটা তার মধ্যে কেই বা পড়বে আর কেনই বা পড়বে?

অনিন্দ্য হাতদুটো পেছনে সোজা করে ভর দিয়ে হেলে বসল। মাথা কাত করে রুমির দিকে তাকিয়ে রইল। ও কিছু বলল না। শুনতেও পেল না কিছু।

—তারপর ভাবো, দু-একটা বের করে যদি আর না চালানো যায়, কীরকম লাগবে তখন আমাদের? এই মুহূর্তে আমাদের সামর্থ্য কতটুকু? আর অন্য কোথাও লেখার কথা যদি বল—

রুমি অনিন্দ্যর হাতে সামান্য চাপ দিল।

—অনি, আমরা বোধহয় আমাদের সময়টুকুর উপর ভাগ বসাতে দিতে যাচ্ছি।

রুমির হাতের তালু কী নরম। মসৃণ। উষ্ণ। ছোটো-ছোটো আঙুলগুলো কী ভীষণ দুর্বল। যেন সামান্য চাপ পড়লে এক্ষুনি গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে। অনিন্দ্য হাত সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল।

—কিন্তু কোনো কাজের মধ্যে থাকা কি ভালো নয়, অন্তত অভ্যাসের খাতিরে?

অসচেতনভাবে অনিন্দ্য তর্ক তোলার চেষ্টা করল। অথচ খেয়াল করল রুমির হাতের আলগা মুঠোর







থেকে ওর হাতটা এখনও সরিয়ে নিতে পারে নি। তর্ক টানার সচেতনতা ওকে পেয়ে বসল।

—আর কী করলে মনে কর আমরা আমাদের সময় নষ্ট হতে দেব না?

ওর দু হাতের ফাঁকে রুমির ছোট্ট হাতটা ঢেকে দিয়ে অনিন্দ্য সেটা পিষে ফেলতে গেল। আর ঠিক তখনই মনে হল এটা বোধ হয় প্রথমবার···আগে কখনো ও রুমিকে এতখানি···মনে পড়ছে না···ঘুরিয়ে বলা যেতে পারত বোধ হয় কথাটা···ফেরানো যেতে পারে বড্ড ফর্ম্যাল শোনাবে না তো···

—একটা রিল্‌কে কিনেছি। আজই। প্যাকেটটা এখনো খুলি নি। এর পরে যেদিন আসবে পড়ে শুনিও।

অনিন্দ্যর মনে হল রুমি ওর শেষের একটা কথাও শোনে নি। কিংবা হয়তো শুনেওছে। ওর মুখের চামড়া বড়ো বেশি মসৃণ—কোনো ভাঁজ ফুটে উঠলে বুঝতে পারত। অবশ্য এখানে বড্ড অন্ধকার।

তারপর ওরা বসে রইল আরো কিছুক্ষণ। অনিন্দ্যর মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল ডুইনো এলিজি আর অফিয়ুসের প্রতি সনেটের লাইনগুলো। ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে। আর রুমি চোখ বুজে গোনার চেষ্টা করল বাগানে সবশুদ্ধ কটা নয়নতারা।

অন্ধকার ঘরে মমতা চুপচাপ বসে ছিল। ওর সামনে ইজিচেয়ারে-শুয়ে-থাকা মানুষটা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছু কথা বলা যেতে পারত। ও তাই চাইছিল। পুরোনো কোনো কথা। মাঝে-মাঝেই প্রসঙ্গ তোলার চেষ্টা করে। মমতা থামিয়ে দেয়। ওর ভালো লাগে না। অর্থহীন এই জাবর-কাটা। যে মুহূর্তগুলোর সঙ্গে ছোটো-ছোটো নানা দুঃখজনক ঘটনা, কষ্টের কথা, টুকরো কয়েক হাসি বা আনন্দ মিশে ছিল, তখনকার জন্যই জরুরি ছিল সেগুলো। পরে তাদের মনে করে উপর থেকে আলগা সুখানুভূতির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যায় না। অন্তত মমতা চেষ্টা করে দেখে নি। শুধু রোজ বিকেলে ফিরে রান্নাঘরের সামনে এসে ও যখন বাজারের থলেটা নামিয়ে রাখে, মমতা বুঝতে পারে মুখে আগের দিনের চেয়ে আরেকটা বেশি বলিরেখা ফুটে উঠেছে। কপালের ওপর আরো কয়েকটা পাকা চুল। এইভাবে ও একটা আয়না হয়ে ওঠে মমতার সামনে। মনে করিয়ে দেয় মমতার শরীর আর মনেও একটু-একটু করে একটা ধূসর জমি তৈরি হচ্ছে। নিজের অজান্তেই ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমা মুখে, গালে, চোখের নীচে। বলিরেখা খোঁজার চেষ্টা।

কিছুটা আলো এসে পড়ল মমতার মুখের উপর। পরদা সরিয়ে দরজায় অনিন্দ্য দাঁড়িয়ে।

—মাসিমা, আসছি।

মমতা উঠল। অনিন্দ্যর পেছনে রুমি।

—এখনই? কটা বাজে? রাতে খেয়ে যেতে পারতে।

—প্রায় নটা। এরপর খেতে বসলে দেরি হয়ে যাবে। হস্টেলের দরজা বন্ধ করে দেবে।

কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা ঠিক করে অনিন্দ্য হাসল।

—আচ্ছা। ছুটির দিন দেখে সকাল-সকাল এসো তাহলে।

তারপর রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে রুমিকে বলল, বাইরের দরজায় তালাটা একেবারে লাগিয়ে দিয়ে আসিস।

রাতের অন্ধকারে এই একফালি বাগানটাকে আশ্চর্য সুন্দর মনে হয় রুমির। চোখে-মুখে-ঝিম-ধরানো। ঘরের সিঁড়ি থেকে নেমেই বাগানের গেট অবধি কয়েকটা ইট পরপর পাতা। ইটগুলোর ফাঁকে কতগুলো ছোটো-ছোটো লতানে চারা উঁকি দিচ্ছে। ওরা সবাই অপেক্ষা করছে দু-এক ফোঁটা শিশিরের জন্য। ওই লঙ্কার ঝাড়গুলোর উপর, প্রায় মরতে বসা রজনীগন্ধার ডাঁটিগুলোর উপর, নয়নতারার পাপড়ির উপর একটু-একটু করে যখন শিশির জমবে, ওরা জেগে উঠবে আরেকটা দিনের জন্য, কী শান্ত থাকবে

তখন মুহূর্তগুলো, চারপাশের বাড়িঘর আর সবকিছু। অনিন্দ্যর কেমন লাগে, ওই সময়—কালো অন্ধকারে ওরা যখন জেগে বসে থাকে, আর পাতলা ঠাণ্ডা ভোরে ফোঁটা-ফোঁটা শিশির সবুজ পাতার শিরা চুঁইয়ে-চুঁইয়ে পড়ে নীচের মাটি ভিজিয়ে দেয়?

রুমি জিজ্ঞাসা করল না। ও অপেক্ষা করল অনিন্দ্যর গেট খোলার জন্য, বাইরে বেরোনোর জন্য আর খানিক এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে হাতনাড়ার জন্য। যাওয়ায় সময় প্রতিবারই অনিন্দ্য পেছন ফিরে একটু হাসে। কী অসহায় ওকে লাগে তখন।

বাবার ঘরে ঢুকল রুমি। একইভাবে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন ইজিচেয়ারে। ও ঘুরে পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল। ইজিচেয়ারের গা ঘেঁষে। প্রায় চুলই সাদা হয়ে গেছে বাবার। উলটে পেছন পেতে আঁচড়ানো। ছোট থাকতে রোজ অফিস যাওয়ার আগে ও বাবার চুল আঁচড়ে দিত। ছুটির দিন দুপুরবেলা বাবা কখনো-কখনো বলতেন দু-একটা পাকা চুল তুলে দিতে। রুমি দিত না। থাক না, ভালো দেখাচ্ছে। বাবা হাসতেন।

বাবার কাঁধে হাত রাখল ও। কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে আস্তে-আস্তে বলল—মা খাবার গরম করছে। গা ধুয়ে নাও।

অনাদিবাবু চোখ খুললেন। সত্যি-সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি? কোনোদিন এরকম অসময়ে ঘুমোন না। গা ভারী-ভারী লাগছে।

বাথরুমে ঢুকে পরপর দু বালতি জল মাথায় ঢাললেন অনাদিবাবু। তারপর দাঁড়িয়ে রইলেন। অসংখ্য ধারায় সমস্ত শরীর বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

শীত-শীত করছে সামান্য। চোখে অল্প জ্বালা। রাত করে এতটা জল না ঢাললেই হত। তাড়াতাড়ি গা মুছে অনাদিবাবু বেরিয়ে এলেন।

চুল আঁচড়ে এসে দেখলেন রান্নাঘর থেকে রুমি থালা নিয়ে টেবিলে রাখছে। অনাদিবাবু মমতার বসার কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। ও সবসময় পরে খায় ওদের হয়ে গেলে। অনাদিবাবু বুঝতে পারেন না একসঙ্গে বসলে কী অসুবিধা। দু-একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এখন আর করেন না।

—রুমি, নুনের বাটিটা দিস তো। ভাত ভাঙতে-ভাঙতে অনাদিবাবু বললেন।

—আর আমায় আরেকটু ভাত কমিয়ে দিও। এটা মমতার উদ্দেশ্যে।

—এতটাই তো খাও। কমাব কেন? ভুরু কুঁচকে মমতা এগিয়ে এল।

অনাদিবাবু চুপ করে রইলেন। শুধু হাতের উলটো পিঠ দিয়ে ঠেলে সরিয়ে রাখলেন কিছুটা।

—কদিন আগে বলছিলি কোনো একটা পেপারের উপর তোদের নাকি কোনো বই-ই প্রায় নেই, সেটাতে অসুবিধা হচ্ছে না?

—প্রোফেসররা কিছু জেরক্সড কপি দিয়েছেন। বাকিটা লাইব্রেরিতে বসে সারতে হবে।

মমতা আরেকটু আলুপটোলের ডালনা দিতে গিয়েছিল। রুমি হাত উপুড় করল।

—কলেজ লাইব্রেরি? অনাদিবাবু সবটুকু ডাল বাটি থেকে ঢেলে নিলেন।

—এক টুকরো গন্ধরাজ লেবু দিও তো। আছে? মমতার দিকে চাইলেন অনাদিবাবু।

—থাকবে না কেন?

তরকারির বাটি টেবিলে রেখে মমতা রান্নাঘরে গেল।

—ন্যাশনাল। জানাল রুমি।

—যেদিনই যাস, টিফিন নিয়ে যাস। এখান থেকে অনেকটা।

নুনটুকু সরিয়ে অনাদিবাবু লেবুর জন্য জায়গা করলেন।

—সবটা ভাত ডাল দিয়ে মেখে নিলে, মাছ আছে তো। মমতা মাছের বাটিতে হাতা ডোবাল।

—একটুকরো মাছই শুধু দিও। ছোটো দেখে। ঝোল আলু না।

রুমির খাওয়া হয়ে গেছে। ও উঠে পড়ল। অনাদিবাবু মমতার দিকে তাকালেন।

—তুমি এবার বসে পড়ো।

—কাজ আছে। দুধটুকু আরেকবার ফোটানো দরকার।

মমতা দুটো টুকরো দিতে গিয়েছিল। অনাদিবাবু বারণ করলেন।

রুমি বিছানা ঝাড়ছে। ও-ই রোজ বিছানা পেতে দেয়। প্রথম-প্রথম অনাদিবাবু এ ঘরে যখন ঢুকে-ছিলেন, নিজেরটুকু নিজেই করে নেব—এরকম একটা ইচ্ছে পেয়ে বসেছিল। বিছানা পাতা আর মশারি ভাঁজ করা দিয়েই শুরু করেছিলেন। তারপর রুমি একদিন মুখ টিপে হেসে বলেছিল, বাবা, তোমার এ ব্যাপারটা ঠিক আসে না। ওটা আমিই করব'খন।

মশারি টাঙানো হয়ে গেছে। অনাদিবাবু টেবিলের উপর রাখা মৌরির কৌটো থেকে সামান্য একটু মুখে পুরলেন।

—শেখরকাকুকে তোর মনে আছে?

—অল্প-অল্প। কেন বলো তো? মশারি গোঁজা থামিয়ে রুমি ফিরে বসল।

—হঠাৎ মনে পড়ল। কলেজে পড়তে আমাদের একটা আড্ডার জায়গা ছিল, বুঝলি। মহম্মদ আলী পার্কে। প্রায় রোজ বিকেলে আমরা ওখানে হাজির হতাম। শেখরই নিয়ে যেত বলতে পারিস। আমরা যেতাম কিমার ঘুগনির আশায় আর ওর খেলা দেখতে।

—তোমরা খেলতেও?

—আমরা না, ও। দাবা খেলত। ব্যাগে করে বোর্ড আর গুটি নিয়ে যেত। লোক জোগাড় হত ওখানেই। তারপর শুরু হ'ত। দু-একটা চালের মধ্যেই ও অ্যাসেস করে নিতে পারত। তারপর খুব কায়দা করে বলত, আমি মন্ত্রী তুলে রাখছি। মন্ত্রী ছাড়াই খেলব। হতভাগ্য ভদ্রলোকটি যখন তাই দেখে অবজ্ঞামেশানো মুচকি হাসতেন আমরা শেখরের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝতে পারতাম সেদিনও ঘুগনি আর চা পাচ্ছি।

—মানে?

—মানে ও জিতছে। আর জিতলেই 'ট্রীট'।

—দাবা খেলত, তা অঙ্ক করত কখন?

রুমি শুনেছিল শেখরকাকু অঙ্কে গোল্ড মেডলিস্ট।

—সেটা আমরাও জানতাম না।

—আগে আমাদের বাড়িতে এলে কী দারুণ প্যাঁড়া নিয়ে আসত। আমাকে বলত, খেয়ে দেখো। খোদ বেনারসেও এরকম পাবে না।

—বাপরে, তোর অনেক মনে আছে তো!

—এইটুকুই। আর একবার, বোধহয় জন্মদিনেই, 'বুড়ো আংলা' আর 'নালক' দিয়েছিল মনে আছে।

—অদ্ভুত ছেলে। ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়ে ইলিনয় যাওয়ার বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। টিকেট কাটা শুধু বাকি। হঠাৎ হাওড়ার কোনো একটা স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেল।

—হঠাৎ শেখরকাকুর কথা বলছ এত?

—মনে পড়ছে খুব। রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে আমাকে টানতে-টানতে নিয়ে গিয়েছিল শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি শোনাতে। আমি তখন দিনে চাকরি আর সন্ধ্যে ট্যুশন করি। হুজুগের থেকে গা বাঁচাতে চাই। দেখি সকাল ন-টায় বাড়ি এসে হাজির। বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে। ছাতা ব্যাগ নিয়ে অফিস যাওয়ার তোড়-জোড় করছি, আমায় আটকে দিল। রাস্তায় বেরিয়ে ছেড়ে দেওয়ার জন্য শেষবার মিনতি করতে আমায় বলেছিল, তুই একটা ক্ল্যাসিক ইডিয়ট। বাঙালি তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ডোডো পাখিদের দেখতে চাস না। বেঁচে আছিস কেন বল তো?

অনাদিবাবু হাসলেন।

—এখনও বুকের মধ্যে গমগম করে, জানিস। আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী···। যা শুয়ে পড়। তোর মার বোধহয় খাওয়া হয়ে গেছে।

রুমি বাথরুমে দেখতে লাগল। অনেকদিন বাদে। ঘরে ঢুকতে মমতা বলল, রান্নাঘরে দুধের প্যানটা বোধহয় আলগা আছে। ঢাকা দিয়ে আয় তো। আর ওদিকের জানলাগুলো বন্ধ করে দিস।

রুমি ফিরে এসে চিরুনি-ফিতে নিয়ে বসল। সন্ধেবেলা চুল বাঁধা হয় নি।

একটা শাড়ি আলনার নীচে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। মমতা সেটা তুলে ভাঁজ করতে লাগল।

—অনিন্দ্যকে আজ চুপচাপ দেখলাম। কিছু হয়েছে নাকি?

—জানি না তো।

রুমি মাথার পেছন থেকে ফিতেটা একপাক ঘুরিয়ে এলে দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরল।

—ওর পড়াশুনা কেমন চলছে?

শাড়িটা ভাঁজ করা হয়ে গেছে। মমতা আলনায় ওটা রেখে দিল।

—পরীক্ষায় তো দেখি ভালোই করে।

হাত বাড়িয়ে চিরুনিটা তাকে রেখে মশারির ভেতর ঢুকে গেল রুমি।

—এরপর কী করবে?

—সেটা ওকেই জিজ্ঞেস কোরো। রুমি পাশ ফিরল।

মমতা আর কিছু বলল না। ও লক্ষ করে দেখেছে রুমি কখনোই কোনো কিছু পরিষ্কার করে বলে না অনিন্দ্যর ব্যাপারে।

দেওয়ালের দিকে সরে রুমি উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়ল এত তাড়াতাড়ি? ওর পায়ের ওপর কাপড়টা সামান্য উঠে গেছে। মমতা ঠিক করে দিল। মশারি সামান্য ফাঁক করে আলো নেভাল। শুয়ে পড়ল তারপর।

রাত বাড়ল।

মমতা চিত হল। রুমি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওর কলেজ পেরোতে আর বছর খানেক। কাল বাজার না গেলেও চলবে। লাউ আছে একটা। লাউ বড়ি দিয়ে বড়ো করে নরম-গরম তরকারি, ডাল আর দই তো পাতা আছেই। ওকে বলতে হবে বিকেলে আসার সময় একটু হিং আনার জন্য। এই রোববার বারাসাত যাওয়া যেতে পারে। দুলুদা বাড়ি করেছে। অনেক-বার যেতে বলেছে। ও ঘরের বিছানার চাদরটা বদলান দরকার। সপ্তাহ খানেকের উপর হতে চলল। আর কালকে ও ফিরলে বলতে হবে পুজোয় কোথাও যাওয়ার জন্য। বহুদিন দূরে কোথাও যাওয়া হয় না। খুব দূরে না হোক, রাঁচি কিংবা দেওঘর অন্তত। বড্ড তাড়াতাড়ি ভাঙছে ওর শরীরটা। খাওয়া-দাওয়া ভীষণ কমে গেছে। জোর করে দিয়ে দিল, একেবারে রুপোর চাঁদির মতো ইলিশ, রাগ কোরো না····· অনেক অনেকগুলো ফাল্গুনের পেছন থেকে টপকে চলে আসা কথা কটা, আরো অনেক অনেক কথা··· সন্ধেবেলায় মনে আসা সাজানো যুক্তিগুলো ভেসে গেল·····মমতা থামাতে পারল না।

মাথার কাছে টেবল ল্যাম্প নেভাতে অনিন্দ্য ভুলে গেল। ঘরের ওই কোণে চালিয়াত প্লাস্টিক, সমস্ত মেঝে জুড়ে ধুলো আর কাগজের টুকরো, পায়ের কাছে দলা পাকানো ছেড়ে রাখা পানজাবি আর বিছানাময় ছড়ানো বইয়ের মধ্যে অনিন্দ্য নির্বিঘ্ন আরামে ঢেকে ফেলল নিজেকে। তারপর চড়া রোদে ঘুরে বেড়াতে লাগল বুলেভার্ড সেইন্ট মিশেল্-এর পথে পথে। একজন কবির পায়ের ছাপ ধরে। বিশেষ কোনো এক কাফের খোঁজে। এলিজিগুলো তাঁর মুখ থেকে শুনে নেওয়া দরকার। অন্য কাউকে শোনাবার আগে।

রুমির সামনে অন্ধকারে সাদা দেওয়ালের ওপর গাঢ় সবুজ নীল প্রলেপ পড়ল। রক্তলালরঙা পাঁচজন মানুষ-মানুষী ঘুরে-ঘুরে নাচতে লাগল। উদ্দামভাবে।





মাতিসে হারিয়ে গেল রুমি।·····সবুজ নীল ফিকে হল। লাল মানুষের দল অদৃশ্য হল। বেরিয়ে এল জনা কয়েক ব্যালেরিনা। মায়াবী ছন্দ জেগে উঠল সবুজ-নীলে। দু হাত দিয়ে রুমি নিজেকে জড়িয়ে ধরল। সমস্ত গায়ে অদ্ভুত শিরশিরানি। মাসের ওই ক'টা দিনের মতো। ভিজে নরম মেঘে রুমি ডুবতে লাগল একটু-একটু করে। খুব চেনা-চেনা একটা মুখ ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে। রুমি হাত বাড়াল।

অনাদিবাবু দেখলেন তাঁকে নিখুঁতভাবে ঘিরে-থাকা মশারিটা ছোটো হয়ে আসছে। জানলার পরদাগুলো নৌকোর পালের মতো ফেঁপে-ফুলে অস্থির। চারদিকে জলপ্রপাতের ঢল নেমেছে। একটা বড়ো পাথর দিয়ে মুখ আটকানোর চেষ্টা করলেন। পারলেন না। একরাশ সাদা ফেনা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। নিজেকে একটা কালো পোকার মতো দেখাচ্ছে। ভাসতে-ভাসতে, ঠোক্কর খেতে-খেতে নীচের দিকে নামছেন। মশারি ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গেল হঠাৎ। ঘরময় রাশিরাশি ফেনা। অনাদিবাবু অনেকক্ষণ ধরে ডুবলেন। তারপর আর ডুবলেন না। চিকচিক বালি আর পাথর। সাদা ফেনা শুকিয়ে অজস্র ভাঙা ঝিনুকের টুকরো। সদ্য-জেগে-ওঠা একমুঠো আগাছা ছুঁলেন অনাদিবাবু। এদের নাম জানেন না। জমাট কালো অন্ধকারে, অনেক জলপ্রপাতের ভেতর থেকে আর সোনালি সাদা বলির ভেতর থেকে আর গোলাপি ঝিনুকের বাটির ভেতর থেকে উথলে উঠল বেলফুলের গন্ধ। তারপর মিলিয়ে গেল। ঠিক মণ্ডলদের বুনো বাগানের উপর গোল হয়ে ঘুরতে-ঘুরতে মরাখালের দিকে মিলিয়ে-যাওয়া গাঙচিলটার মতো।

# কমিউনিস্ট দুনিয়ার আলোড়ন ও সমাজবাদের ভবিষ্যৎ

সুনীল সেন

উগ্র বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী এক মঞ্চে মিলিত হয়ে ঘোষণা করেছেন, সমাজবাদ ভেঙে পড়েছে, পেরেস্ত্রোইকা এবং গ্লাসনস্তের কল্যাণে সমাজবাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। কমিউনিস্ট দুনিয়ার আলোড়নের উৎস কী? সমাজবাদের ভাঙন কি সত্যি আসন্ন? সোভিয়েত রাশিয়ার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান কী? সামাজিক পরিবর্তনের মূল গতি কোন্ দিকে?

কমিউনিস্ট দুনিয়ার আলোড়নের উৎস সন্ধানে অনেক লেখক স্তালিনবাদকে দায়ী করেছেন। স্তালিন-পর্বে, বিশেষ করে ১৯৩০-৪০ কালপর্বে, সমাজবাদের ভাবমূর্তি ম্লান বিবর্ণ হয়েছিল। এই সময় পুরনো বলশেভিকরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হন। ১৯৩৪ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির ১৩৯ জন সভ্যের মধ্যে ১১০ জন হয় নিহত হন কিংবা আত্মহত্যা করেন। ১৯২৯-৩৩ কালপর্বে যৌথ-কৃষি প্রবর্তনের ফলে প্রায় এক কোটি কৃষক নিহত হন; বহু গ্রাম জনশূন্য হয়; কৃষির উৎপাদনে দেখা গেল গভীর সংকট। লেনিনের প্রবর্তিত সমবায়প্রথা ধ্বংস হয়ে যায়। দ্রুত শিল্পায়ন রূপায়িত করবার জন্য স্তালিনের অনুসৃত কৃষিনীতি আদৌ অপরিহার্য ছিল না। বিষয়টি বোঝবার জন্য বুখারিনের "পলিটিকাল টেস্টামেনট অব লেনিন" (১৯২৯) পড়া উচিত। লেনিনের শেষ লেখার ভিত্তিতে বুখারিন এক বিকল্প নীতি পেশ করেছিলেন। সমবায়প্রথা কৃষক বোঝে; যৌথ খামার মাঝারি এবং ধনী কৃষকের স্বার্থের অনুকূল নয়। মুষ্টিমেয় "কুলাক"-দের ধ্বংস না করে তাদের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন করা উচিত; গ্রামে মাঝারি কৃষক "কুলাক"-দের অনুগামী। সকল বর্গের কৃষকদের মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত হবে কৃষিনীতি। একদিকে "কুলাক"-কে নিরপেক্ষ রাখা, অপরদিকে পশ্চিম ইউরোপের প্রয়োগবিদ্যার প্রবর্তন কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধির সহায়ক হবে। বুখারিনের বক্তব্য নিঃসন্দেহে অভিনব। সেদিন তাঁর বক্তব্য অগ্রাহ্য





হয়েছিল।

স্তালিনবাদের সমালোচনা সঙ্গত। কিন্তু সমাজবাদের সংকট বুঝতে হলে কমিউনিস্ট পার্টির কাঠামোর উপর দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। অনেকের জানা নেই যে, লেনিন-পর্বে পার্টির মধ্যে যে স্বাধীনতা ছিল তার তুলনা বিরল। অসংখ্য বিষয়ে পার্টির মধ্যে প্রায় অবিরাম বিতর্ক চলেছিল। সশস্ত্র ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ প্রকাশ্য বিবৃতি দেয়া সত্ত্বেও তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি। নেতা এবং সভ্যদের বিরুদ্ধ মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল। পার্টি কংগ্রেস ছিল সার্বভৌম। সাধারণ সম্পাদকের পদের তখন সৃষ্টি হয় নি। লেনিনের শেষ জীবনে পার্টি-কাঠামোর পরিবর্তনের শুরু। ১৯২১ সালে লেনিন স্বয়ং রচনা করেন তথাকথিত "ঐক্য প্রস্তাব"। এই প্রস্তাব অনুসারে, দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে যে-কোনো সভ্যের বহিষ্কারের বিধান হল। অনিবার্যভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির এক গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। ১৯২২ সালে সাধারণ সম্পাদকের পদ তৈরি হল এবং স্তালিন হলেন সাধারণ সম্পাদক। সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে স্তালিনের অপসারণের যে প্রস্তাব লেনিন করেছিলেন, তা গৃহীত হয় নি। সূর্যস্বরূপ সাধারণ সম্পাদককে আবর্তন করতেন কেন্দ্রীয় কমিটির সখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নামে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার অবলুপ্ত হল; প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব ধীরে-ধীরে পরিণত হল সাধারণ সম্পাদকের একনায়কত্বে। পার্টি কংগ্রেসের গুরুত্ব এবং ক্ষমতা হ্রাস পেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পূর্ব ইউরোপের প্রায় সব কটি দেশে প্রধানত লাল ফৌজের সাহায্যে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রুশ মডেল হুবহু অনুসরণ করে এইসব দেশের পার্টি। পুরনো নেতৃত্বের একটি বড়ো অংশ নিশ্চিহ্ন হয়; স্তালিন-পন্থী নতুন নেতৃত্ব পুরোভাগে আসে। বলপ্রয়োগ এবং আমলাতান্ত্রিকতা হয় কমিউনিস্ট পার্টির এক-দলীয় শাসনের ভিত্তি। হাঙ্গেরির রাকোসি, জার্মানির হোনেকার, রোমানিয়ার চৌসেস্কু পার্টির কাঠামোয় সৃষ্টি। তাঁদের উত্থান দৈবাৎ ঘটনা নয়। কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা গিয়েছিল। ১৯৫৩-য় পূর্ব বার্লিনে গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৫৬-য় পোল্যানডের পোজনানে শ্রমিক ধর্মঘট, ওই বৎসরে হাঙ্গেরির বিপ্লব, ১৯৬৮ সালে "প্রাগ বসন্ত" অনেকের হয়তো মনে পড়বে। এই ঘটনাগুলিকে বলা চলে আসন্ন ঝড়ের সংকেত। কিন্তু কমিউনিস্ট শাসন, পার্টির কাঠামো সাধারণভাবে অপরিবর্তিত রইল। অবশেষে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রবর্তিত পেরেসত্রোইকা এবং গ্লাসনস্তের ধাক্কায় বিস্ফোরণ ঘটে গেল পূর্ব ইওরোপের দেশে-দেশে। রোমানিয়ার বিপ্লব অবিস্মরণীয়। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠিত একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধানত কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী এবং যুবসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব রোমানিয়ার বিপ্লবে প্রতিভাত। চৌসেস্কুর নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিরোধ দ্রুত ভেঙে গেল।

পূর্ব ইওরোপের ঘটনা বুঝবার জন্য লেনিনোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল মার্কসবাদী গ্রামসির বক্তব্য সহায়ক হতে পারে। ক্ষমতা দখলের সঙ্গে-সঙ্গে পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা নিঃশেষিত হয় না। ক্ষমতা দখলের পরে পার্টিকে পালন করতে হবে নতুন ভূমিকা। অবিরাম জনসমর্থন সংগ্রহে পার্টির প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। এবং এই কাজে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়, ক্লাব জনগণের উপর নেতৃত্ব (hegemony) প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। বলপ্রয়োগ এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বর্জনীয়। এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের 'withering away of the state' তত্ত্ব মনে পড়ে। পিছনের দিকে ফিরে তাকালে বলা চলে, কমিউনিস্ট দুনিয়ার প্রায় সর্বত্র রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ পুরোভাগে এসেছিল; আমলাতান্ত্রিকতার প্রসার ঘটেছিল। অনিবার্যভাবে সামাজিক অগ্রগতির

সম্ভাবনা অবরুদ্ধ হয়েছিল।

এর অর্থ কি এই যে, অনুন্নত দেশে ( রাশিয়া, পোল্যানড, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, চীন, ভিয়েৎনাম অনুন্নত দেশ বলে গণ্য ) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে? সাম্যবাদী দুনিয়ার ইতিহাস কি শুধু ব্যর্থতার কাহিনী? বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের যেতে হবে ফরাসি বিপ্লবের শেষ পর্বে। এই কালপর্বে দেখা গিয়েছিল বিপ্লবী জ্যাকোবিন দলের পতন এবং থার্মিডর (Thermidor), যার পরিণতি সামরিক নেতা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উত্থান। এখনো কমিউনিস্ট দুনিয়ার কোনো দেশে থার্মিডর এবং বোনাপার্টিজম আত্মপ্রকাশ করে নি। পেরেস্ত্রোইকা এবং গ্লাসনস্ত প্রবর্তন করে সি পি এস ইউ ( রুশ কমিউনিস্ট পার্টি ), কোনো বহিরাগত শক্তি নয়। দক্ষিণ-বাম আক্রমণ সত্ত্বেও সি পি এস ইউ-র সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশ এখনো ঐক্যবদ্ধ। চীনে তিয়েনআনমেনের ঘটনা উদ্বেগজনক, কিন্তু মনে হয় সেনাবাহিনী এবং কৃষকসমাজ পার্টি নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন। গ্লাসনস্তের কঠোর সমালোচক হলেও ভিয়েৎনামের পার্টি এখনো রুশবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে নি, অর্থনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনে হো-চি-মিনের পার্টি আগ্রহী। পূর্ব ইওরোপের নির্বাচনে কোথাও কমিউনিস্ট পার্টি মুছে যায় নি; রোমানিয়ায় কমিউনিস্টরাই এখনো পুরোভাগে আছে।

ব্যতিক্রম জার্মানি। ঐক্যবদ্ধ জার্মানির প্রতিষ্ঠা নতুন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। ঐক্যবদ্ধ জার্মানি যদি ওডার-নীস সীমানা (Oder-Neisse line) মানতে অস্বীকার করে? সে যদি ১৯৩৭-র সীমানায় ফিরে যেতে চায়? পশ্চিম জার্মানিতে সামরিকবাদ এবং নাৎসিবাদ কি মুছে গিয়েছে? ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সহজে বিস্মৃত হওয়া কঠিন। টয়েনবির সাবধানবাণী মনে পড়ে: The night more vision of Prussian Germany and Nazi Germany will continue to haunt my memory as long as I live। ঐক্যবদ্ধ জার্মানির উত্থানে সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্বেগ আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা রুশ জনগণ ভুলবে কী করে? পশ্চিম জার্মানিতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা শক্তিশালী হলেও প্রতিহিংসাকামী ফাসিস্টরা এখনো সেনাবাহিনীতে এবং যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে সক্রিয়।

জার্মানিতে বোনাপার্টিজম এর বিপদ থাকলেও সাধারণভাবে বলা চলে যে, সোভিয়েত রাশিয়ার অনুসৃত বৈদেশিক নীতি বিশ্বশান্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে সমাজবাদের আদর্শকে সুরক্ষিত করেছে। ঠাণ্ডাযুদ্ধের উপর যবনিকা কল্পমান। পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ আজ দিবাস্বপ্ন নয়। আমেরিকা-সোভিয়েত চুক্তির ফলে intermediate এবং shorter range missiles অবলুপ্ত হয়েছে; রাসায়নিক অস্ত্র হ্রাস পাচ্ছে। পূর্ব ইওরোপের পরিবর্তনের ফলে ওয়ারশ চুক্তি ভঙ্গুর। পশ্চিম ইওরোপের সামরিক নীতির ভিত্তি চূর্ণ; ওয়ারশ চুক্তির মাধ্যমে রুশ আক্রমণের ভীতি বিলীয়মান। ফলে অনিবার্যভাবে ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। যে পরিমাণে পূর্ব ইওরোপে গণতন্ত্র প্রসারিত হবে, সেই পরিমাণে ইওরোপের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। দুটি সামরিক ব্লকে ইওরোপ বিভক্ত থাকবে না।

কিছু উগ্র বামপন্থীর মতে, সোভিয়েত রাশিয়ার নীতির ফলে তৃতীয় বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম দুর্বল হবে। এঁরা বিশ্বশান্তির আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে পৃথক মনে করেন। বর্তমান অবস্থায় এই দুটি আন্দোলন এক এবং অবিভাজ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আর যুদ্ধ বাধে নি। ১৯৪৫-৯০ কালপর্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন বিপুল শক্তিশালী হয়েছে; এই কালপর্বে ঘটেছে চীন বিপ্লব, কিউবার বিপ্লব এবং ভিয়েৎনাম বিপ্লবের বিজয়। যুদ্ধ বাধলে সামাজিক অগ্রগতির ধারা রুদ্ধ হত। সমাজবাদী আন্দোলনের পশ্চাদপসরণ ঘটত।





সামরিকবাদ সমাজবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করে। এর দৃষ্টান্ত জার্মানি।

বিশ্বশান্তি আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা সমাজবাদীরা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং যুদ্ধবাজদের চক্রান্ত চূর্ণ করে সমাজবাদীরা রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে আসবেন। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে মানবিক সমাজবাদ নিয়ে গবেষণা। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীরা এই গবেষণায় নিমগ্ন। একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে আকাশ ভেঙে পড়বে না। গবেষণায় সহজ সাফল্যের স্থান নেই।

নতুন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় ২৮তম পার্টি কংগ্রেসের জন্য রচিত সি. পি. এস. ইউ-র খসড়া দলিলে। সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান বুঝতে হলে এই দলিল পড়া উচিত। আমরা এই দলিলের সারমর্ম উপস্থিত করব।

দলিলে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিকল্পনা। বাজার অর্থনীতি চালু হবে, যার ভিত্তি প্রতিযোগিতা। সেই সঙ্গে স্বীকৃতি পেয়েছে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা: Modern production is impossible without centralized planned management। পরিকল্পনা এবং বাজার-ব্যবস্থা পাশাপাশি চলবে; ক্রেতাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের চেষ্টা হবে। "কমানড ইকনমির" পর্ব শেষ।

পেরেস্ত্রোইকার লক্ষ্য এবং পদ্ধতি অধিকতর গণতন্ত্রীকরণ। সোভিয়েত রাশিয়া হবে 'a law-governed state and a self-governing socialist society'। এই রাষ্ট্রে একটিমাত্র শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র থাকবে না; নাগরিকদের সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং রাষ্ট্রের যে-কোনো পদে নিযুক্ত হবার অধিকার স্বীকৃত হবে। দল গঠনের অধিকার নাগরিকদের দেয়া হবে। কমিউনিস্ট পার্টি শাসক পার্টি থাকবে, অবশ্য গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে পার্টি কাজ করবে ('it will preserve its status as the ruling party within the framework of a democratic process. It will seek to win votes at the elections…. The party does not assume full state powers.')।

সেই সঙ্গে চলবে পার্টি-কাঠামোর পরিবর্তন এবং পার্টির গণতন্ত্রীকরণ। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির পুনর্বিবেচনা হবে; পার্টির মধ্যে বিতর্কের সুযোগ দিয়ে পার্টি-সভ্যদের অধিকার সুরক্ষিত হবে; সংখ্যা-লঘুদের মত আঁকড়ে থাকবার অধিকার থাকবে ('We should re-think the principle of democratic centralism and no longer treat it in such a way that it can be used to implement barracks-type hierarchical discipline. The CPSU needs genuine democratization in intra-party debates…')। ( এই দলিলের পূর্ণ বয়ানের জন্য দ্রষ্টব্য, *Socialism : Theory and Practice*, May, 1990 )।

ধ্রুপদী মার্কসবাদ পুরোপুরি গ্রহণ না করে অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতি গৃহীত হয়েছে। এই নীতি রূপায়নে বিস্তর সমস্যা দেখা দেবে। জাতিসমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে কয়েকটি অঞ্চলে। সামনের পথ দুস্তর। কিন্তু তাতে বামপন্থীরা আতঙ্কিত কেন? অনেকের হয়ত মনে পড়বে, ক্রুশ্চভ-পর্বে বামপন্থীদের আদর্শগত অবস্থান শেষ পর্যন্ত চরম রক্ষণশীলদের উত্থানে সাহায্য করেছিল। ব্রেজনেভ-পর্বে রক্ষণশীলদের বিজয় প্রতিভাত। রুশ বসন্ত অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হয়েছিল। গোরবাচেভ-পর্বে আবার এসেছে নতুন বসন্ত।

[ নিবন্ধটি সম্প্রতি সি. পি. এস. ইউ. কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার মাসাধিক কাল আগে লেখা।—সম্পাদক ]

# অভাগার স্বর্গ

চিত্তব্রত পালিত



শবর-কিরাতের সুন্দরবন কলকাতা, আইন-ই-আকবরীর (১৫৯০) মহাল কলকাতা, শেঠ-বসাকদের সুতো বেচাকেনার হাটগঞ্জ সুতানুটি আর কালীক্ষেত্র কালীঘাট, গোবিন্দজীর গোবিন্দপুর (ষোলো শতকের মাঝামাঝি) পেরিয়ে জোব চার্নকের কলকাতার শুরু সেই ২৪শে অগস্ট, ১৬৯০ সালে। হুগলী-বেতোড়-চট্টগ্রামে পা রাখতে না পেরে ইংরেজ বণিক সুতানুটির হোগলার ছাউনিতেই বাস করতে শুরু করল। আদি গঙ্গার ধারে গঞ্জবাজারের কলকাতাই বা মন্দ কী! চার্নকের চরণপাত থেকেই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী মহানগরী কলকাতার সূত্রপাত। সেই থেকেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দুই ভিন্নধর্মী অর্থনীতি আর সংস্কৃতির টানাপোড়েনে আজকের কলকাতার সৃষ্টি। জোব চার্নকের বেহিসাবের ফসল নয়। নাবিক ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থেই নোঙর ফেলেছিলেন। যার ফলে ১৬৯১-তে বাদশাহি ফরমানে কোম্পানির জমিদারি কলকাতা। মাত্র তিন হাজার টাকা খাজনায় বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার এবং তার অপব্যবহারের অঢেল সুযোগ। সেই থেকে কলকাতায় ব্রিটিশের দুর্গ-ব্যারাক আর তাকে ঘিরে আর্দালি বাজার। গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে দাদন-মাঙনের ব্যাবসা-বাণিজ্য দেদার চলেছে। হলওয়েল ১৭৫২ সালে কলকাতাকে চার-ভাগে দেখিয়েছেন: ডিহি কলকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানুটি আর বাজার কলকাতা। নাগবাজার, লট বাজার, সন্তোষের বাজার, শোভাবাজার, শ্যামবাজার, বউবাজার, লালবাজার, টেরিটিবাজার, রাজাবাজার, রাধাবাজার। বাজার, বাগান, পাড়া মিলিয়ে কলকাতার আদিরূপ। আর বাজার মানেই তোলা। চাষিরা সওদা বেচলে তোলা দেবে, বাজারে ঘর বাঁধলে আরো বেশি দেবে। গরিব এই বেচারামদের বাঁচাতে আবার আইনের কসরত। এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের







কারণে হলওয়েল কলকাতায় চলন্ত কঙ্কালের মিছিলের কথা লিখেছেন। বাবা-মা শিশুকে মাত্র চার টাকায় বেচে দিচ্ছেন। ১৭৬২ সালে আবার দুর্ভিক্ষ, ১২৭৬-এ কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, যার কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন। মানুষ নয়, শুধু ছায়ার পরে ছায়া গ্রাম-গঞ্জকে প্রেতপুরী করে তুলেছে। কঙ্কালই হোক আর ছায়াই হোক, অভাগার দল কলকাতায় ভিড় করতে শুরু করেছে—প্রতি একরে ১৮·৫ জনের ঘন বসতি। বঙ্গোপসাগর মন্থন করে ইংরেজ অমৃত নিতে গিয়ে ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট এদেশের গরলে ফেলে যাচ্ছে আর হোগলার ঝুপড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাই চেটেপুটে নিচ্ছে হাড়-হাভাতেরা। ১৭৫৬ সালে কলকাতার চেহারা এরকম। ৭০৪ একর শহুরে এলাকা, ২৫'২৫ একর গ্রামাঞ্চল, ৪৯৮টা পাকাবাড়ি, ১৪,৪৫০টা কাঁচাঘর বা ঝুপড়ি, বড়ো রাস্তা ২৭টা, ৫২টা গলি, ৭৪টা তন্ত গলি। এ তো অভাগার স্বর্গ।

উনিশ শতকের যবনিকা ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতা জনসংখ্যায় ক্রমশ কল্লোলিনী হয়ে উঠছে। গুদাম, বাজার বাড়ছে। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ জাকিয়ে বসেছে ময়দানে। গঙ্গার ঘাট জমজমাট। শেঠ, বসাক, দেব, মল্লিক, হালদার, রায়, নন্দী, লাহা, শীল, কুণ্ডুরা, ইংরেজ প্রভুদের পিছু-পিছু ছুটছে পরশপাথরের সন্ধানে। ধুলোমুঠিকে সোনামুঠি করবে। আজকের মল্লিকঘাট, বাবুঘাট থেকে বাবু কলকাতার শুরু হয়ে বাগবাজার, পামারবাজার হয়ে ঠেকেছে দমদম, পেনেটি, সুখচরে। যত চুনারি, কাঁসারি, শাঁখারি, কুমোর, কামার, গাড়োয়ান, ধোবা, ওস্তাগর, খানসামা, আর্দালি, মুৎসুদ্দি, মুদি, ছাতাওয়ালার ভিড় সেখানে। গোবিন্দজী আর কালীক্ষেত্র ঘিরে দখনে কলকাতায় আদি গঙ্গার ধারে-ধারেও এদের আস্তানা। সাদা শাসকেরা সেই কালো কলকাতাকে নালা (ক্রীক), খালের (ডিচ)-এর ব্যবধানে রেখে সাদা কলকাতার পত্তনে ব্যস্ত। এরই ভগ্নাংশ আবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে গোবিন্দপুর, কালীঘাট পেরিয়ে আলিপুরে, বেলভেডিয়ারে, গার্ডেনরীচে, টালিগঞ্জে। ময়দানের পুবদিক থেকে যখন চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীট পাড়ার শুরু হল তখন কামাখ্যা সাধু, চৌরঙ্গী বাবারা সশিষ্য উৎখাত হলেন সেই খিদ্দির বৌবাজার-মীর্জাপুরে অর্থাৎ মধ্য কলকাতার দেশী আস্তানায়। জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে আদি সুন্দরবনের শবর-কিরাতেরা কোথায় হারিয়ে গেল। খোড়ো বস্তির মানুষেরা অনেকে আচমকা আগুনে পুড়ে মারা গেল। যারা বাঁচল তারা টিকে থাকল তপসিয়া, বেদিয়াডাঙা, তিলজলার পারে বা আরো পুবের খালবিলের ধারে কোনোক্রমে। বাদবাকি নতুন বস্তি বসাল বৈঠকখানা-রাজাবাজার-ঠনঠনে-কলাবাগানে। অল্প পয়সায় খড়ের গাদা আর কঞ্চি দিয়ে তৈরি এইসব বস্তি জোরে হাওয়া দিলে পড়ে যায়, চড়া রোদ্দুরে পুড়ে যায়, অগ্নিকাণ্ডেরও দরকার হয় না। তবু "সমাচার দর্পণ", "চন্দ্রিকা"য় পড়ুন সেকালের সেইসব বিদগ্ধ কাহিনী। সাদা কলকাতায় সাহেবরা প্রাসাদ তুলেছে লটারি কমিটির টাকায় (তাতেঅনেক নেটিভ লগ্নী করেছেন)। অন্তত নিজেদের চৌহদ্দিতে রাজধানীকে প্রাসাদময়ী করে তুলতে হবে। সেই দেখাদেখি, কালো কলকাতার বহু বাবুমশাই ইমারত গড়ছেন। কিছু গাঁয়ের কাছারি আর সাহেবদের বাসা-বাড়ির অনুকরণে। সৌন্দর্যের চেয়ে কিম্ভূত আড়ম্বর তাতে। সেই সঙ্গে কালীঘাটের পট, কেষ্টনগরের পুতুলের পাশে-পাশে, হাতভাঙা ভেনাস, নগ্ন ইতালীয় নর্তকীর ছড়াছড়ি। জমিদারি, তেজারতি আর ইংরেজের মুচ্ছুদ্দিগিরি করে যে বিপুল বিত্ত তাদের দখলে এসেছে, সেটা কৃষিবাণিজ্যের প্রকৃত উন্নতিতে খাটালে রাজার একচেটিয়া কারবারের নাগপাশে পঙ্গু হয়ে যাবে। রাজরোষে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে। অর্থ অনর্থ হবে। খাজনার বাজনায় মাথা ঝিম-ঝিম করবে। তার থেকে অপব্যয়ে উড়িয়ে দিলে অন্তত তাৎক্ষণিক সুখ। রমরমা হয়। খানাপিনা, বাঈনাচ, আতসবাজি, ঘুড়ি, পায়রার লড়াই, বেড়ালের বিয়ে, বাগানবাড়ি, রক্ষিতার বাড়াবাড়ি। "সাহেব

বিবি গোলাম"-এ যার চিত্র আছে।

### পরিচারক-পরিচারিকা

এই আরাম বজায় রাখতে বিপুল-সংখ্যক সেবাইত দরকার। আর পূর্ব-ভারতের এই হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা একমেবাদ্বিতীয়ম্ শহরে তার অভাব নেই। আগেই লিখেছি, দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে গ্রামবাঙলা বিপর্যস্ত হলে কঙ্কালের মিছিলে কলকাতা ভরে যেত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের অকস্মাৎ অঘটন ছাড়াও নিত্যই করের পেষণে, বেগার খাটার পীড়নে, জমি হারিয়ে, বাস্তু হারিয়ে নিঃস্ব, বিপন্ন মানুষ কলকাতার পাথর-ছড়ানো পথে-পথে মাথা কুটত। কাজ, আশ্রয়, অন্ন চাই। কালো হোক, ধলো হোক, মহাপ্রভুরা যদি কৃপা করে তাঁদের অন্তঃপুরে পায়ের তলায় একটু ঠাঁই দেন। শ্রীচরণভরসা করে দুঃস্থ আত্মীয়রাও এইসব বাড়িতে নিয়মিত পুষ্যি। তার উপরে মোসাহেবদের নিরন্তর কীর্তন। ১৮৪০ সালের আইনে রদ হবার আগে দাসব্যাবসা কলকাতায় কায়েম হয়েছিল। দারিদ্র্য দংশালে ছেলেমেয়ে বেচার রেওয়াজ বহু দিনের। বারো ভূতের পরিবার প্রায়ই নিরন্ন যেত আকাল দেখা দিলে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে এইসব জমিতে উদ্বৃত্ত মানুষদের কাজনেই। জিনিস-পত্রের দাম নাগালের বাইরে। ১৮৪০-এ সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরের অন্যথায় বেআইনি দাসপ্রথা আজও চলেছে একই কারণে। কলকাতার যত বাউণ্ডুলে সাহেবসুবো মেমসাহেবের অভাবে দাসীবাঁদী, সুন্দরী হলে উপপত্নী-রক্ষিতাতে প্রাসাদ ভরিয়ে তুলত। সাহেব করলে মোসাহেব-মুৎসুদ্দিরাও দ্বিগুণ করে এই চাকর-চাকরানির জাঁক দেখাত। খানাপিনা, ঘর-ঘরানির মতো যে যত এই নিরালম্ব মানুষের বাহিনী পুষতে পারত, বাবুসমাজে তার তত মান। সাহেবরাও এই নিয়ে দেমাকে ফেটে পড়ত। এলিজা ফে তাঁর লেখাতে চাকর-বাকরের পরিমাণ নিয়ে বড়াইয়ের কথা লিখেছেন। ধোবা শ্রেষ্ঠ ইংরেজিনবিশ বলে সাহেবের শিরোপা পেয়েছে। পরিণত হয়েছে দোভাষী রতন সরকারে। এই নীচুতলার মানুষেরা নীচুতলা বলতে কেমন পাতালে থাকতেন যদি দেখতে চান এখনও পাথুরেঘাটা, জোড়াসাঁকোর সেই সময়ের বাবুসদনগুলোর বেসমেনট-এ দেখে আসতে পারেন। তেমনি ফে, ফেরী, বাস্টাড, ব্লেচিনডেন, ইডেন, গ্র্যানটের লেখায় আর রেখায় দেখুন পাঙ্খা পুলারদের। পর্যায়ক্রমে দিনরাত টানাপাখার হাওয়ায় প্রভুকে স্নিগ্ধ রাখতে তারা ঘর্মাক্ত ও পরিশ্রমে নিদ্রাতুর। পুরনো লেখাতে ২১ চৌরঙ্গি রোডের চাকরবিলাসী মি. স্টেপলটনের কথা বলেছি। ১৮৬৬-র সুমারিতে দেখা যায় এই দম্পতি আটজন ভৃত্য এবং তাদের পরিবার পুষতেন। ৩ জন বেয়ারা, ১ জন খানসামা, ১ জন খিদ্‌মদ্‌গার, ১ জন কোচোয়ান, ২ জন সহিস। গ্রামে উদ্‌বৃত্ত, শহরে ভ্রাম্যমাণ ভিখারির দল উপযুক্ত কর্মখালি না পেয়ে ভৃত্য হিসেবে মনিবদের নীচুতলায় ঠাঁই করে নিয়েছে। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে হাওয়ার বেগে হুকুম তামিল করেছে অম্লান বদনে। দিন-গুজরান তো হচ্ছে। ১৮৮১ সালে তাই ক্রমবর্ধমান এই সম্প্রদায় সবচেয়ে বহুল কর্মী হয়ে দাঁড়িয়েছে শহরে। পুরুষ ৪১,৭০৮ জন, স্ত্রীলোক, ২১,৯৩৫ জন। কজন আর রুপোকাকা, নলিনকাকা, চারুমাসি, আলতাদিদি হতে পেরেছে। যতদিন এরা সপরিবারে শহরে আসে নি, ততদিন গ্রামীণ থেকে গেছে, ফিরে গেছে মাটির টানে। তারপর আস্তে-আস্তে শহরে শিকড় চালিয়ে গোটা পরিবার প্রাণরস আদায় করে নিতে পেরেছে। ১৮৯১ সালের সুমারিতে ৭৩৫,৫১০ জনের ৩০·৫% জন্ম থেকে শহুরে। এর সিংহভাগ গৃহ-ভৃত্য। যারা শহরে আলো, হাওয়া, আমোদপ্রমোদ শিক্ষাদীক্ষা নিতে পেরেছে, তাদের প্রাণ শিউরে উঠেছে, তাদের নতুন জন্ম হয়েছে। বিশ শতকে এসে শুধু পরিচারিকাদের খতিয়ান নিলেই দেখা যায়, ১৯১১-য় তাদের সংখ্যা ২২,৪০৯, ১৯২১-এ ১৯,৪৯২, ১৯৩৯-এ







১৪,০০০। ১৯৫১-এর সারা ভারতে ভৃত্যদের সংখ্যা ১,৪২৪,০০০ আর কলকাতায় এর মধ্যে ৮২%। ১৯৫৭-৫৮ সালে এর মধ্যে পুরুষ ১১·৬%, রমণী ৬·৬%। এদের সর্বভারতীয় উপস্থিতি কলকাতায়। গয়া, পাটনা, বেনারস, কটক—সবাই মিলেছে কালীক্ষেত্রে। তথাকথিত শিল্পনগরী কলকাতায় শিল্প এমন গড়ে নি যে বাড়তি আগন্তুক ছিন্নমূল মানুষেরা তাতে পুনর্বাসন পাবে। একজন শ্রমিকের পারিশ্রমিকে তেমন একটি পরিবারের ভরণ-পোষণ দুঃসাধ্য। থাকা-খাওয়া-মজুরির নিরাপত্তা একমাত্র গেরস্থালির কাজে। তাই যখন পৃথিবীতে সেবক-সেবিকারা দুষ্প্রাপ্য, এমনকী বোমবাই-দিল্লীতেই মহার্ঘ সহায়, কলকাতায় তারা এখনও বিপুল সংখ্যায় বিপন্ন নরনারী। বিদেশী উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বাঙলো থেকে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোট্টো ফ্ল্যাটে আজও তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এই কাজে দক্ষতা বা দস্তুরির প্রয়োজন নেই। তাই কলকাতার ভৃত্যবাহিনী অফৌহিণী। স্বাধীনতা-লাভের পরেও এমন কোনো শিল্পবিপ্লব বা দিনেন শিল্পায়নও ঘটে নি যে তারা কলকারখানায় শ্রমিকের মর্যাদা পাবে বা সরকারি আনুকূল্যে স্বাধীন ব্যাবসা করবে। ১৯৫১ সালে তাই ১,১৬,৮৭২ জন এই বৃত্তিতে আর ১৯৬১ সালেও রাঁধুনি, পরিচারিকা, চৌকিদার ইত্যাদি মিলিয়ে ১,০৮,০২৮ ভুখা-মিছিলের শেষ উত্তর কলকাতা আজও অভাগার স্বর্গ।

### মেথর-ধাঙড়

ভৃত্যসংবাদ ছেড়ে এবার নীচের মহলের চোরা সিঁড়ি বেয়ে তারো অন্ধকার জগতে ঢুকে পড়া যাক। মেথর-ধাঙড়ের নিষিদ্ধ আঙিনায় লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করে যারা নিজে নীলকণ্ঠ হয়েও শুচিব্রত। এদের জগৎ সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি তাদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট থেকে।

ধাঙড়দের এই ধর্মঘট প্রথমবার হয় ১৮৭৭ সনে। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে মনে হয়েছিল যেন যুদ্ধ। নগরজীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। কেন এই যুদ্ধ? কাদের কর্মবিরতিতে কিভাবে কলকাতা নরকে পরিণত হয়েছিল? শুধু ১৮৭৭ সালে নয়, চল্লিশ বছর পরে ১৯২৮-এ আবারও ঘটনার পুনরাবৃত্তি। নিচের মহলের অভিশপ্ত জীবনের অবসানের দাবিতে, প্রতিশ্রুতিভঙ্গের প্রতিবাদে। ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে রাজধানী কলকাতার ক্রমবিকাশ হলেও ন্যূনতম ময়লা জল/মল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল না। ঘরে-ঘরে খাটা পায়খানা আর ভোরের আলো ফোটার আগে মেথরেরা যেই গন্ধমাদন মাথায় নিয়ে শহরের বাইরে কোনো অকুস্থলে ফেলে আসত। মেথরবাহিনী শুধু বড়ো লোকদের সেবায় নিযুক্ত ছিল। সাধারণ মানুষদের পৌর সুবিধা ছিল না বললেই চলে। এই মেথর/ধাঙড়েরাও গাঁয়ের বেকার মানুষ; সর্দার, ঠিকেদারেরা এদের কলকাতায় নিয়ে আসত, রোজ-গারের ভাগ নিয়ে কাজে লাগিয়ে দিত। পৌরপিতারা সর্দারদের অধীনে এই মেথরদের কয়েকটা দলে ভাগ করে ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে জুড়ে দিতেন। সর্দারেরা কে ক-ঘণ্টা কাজ করবে, মজুরি পাবে, গৃহস্বামীর সঙ্গে রফা করে ঠিক করত। কাঁধের বালতি, ঝাড়ু, ময়লাফেলার ঠেলাগাড়ি সর্দারেরাই যোগান দিত। অনেক সময় বাঁকের প্রান্তে দড়িতে ঝুলিয়ে দুটো বালতি ময়লা নিজেরাই বইত। সবই নিশুতি রাতে সারতে হত। এক-এক দফায় প্রায় পঞ্চাশটা বাড়ির চোরাপথ বেয়ে ময়লা সাফাই করে বালতিবোঝাই ১৬·২০ কেজি ক্লেদ শিরোধার্য করে নিয়ে আসত বিভিন্ন ঘাঁটিতে। এবার তোলা-মেথরেরা ঠেলাগাড়িতে বা তাদের বাঁকে বালতি ঝুলিয়ে নিয়ে যেত গঙ্গার নির্দিষ্ট ঘাটে। বহতা নদীতে নিক্ষিপ্ত হত ময়লার স্তূপ। গঙ্গাকে কলুষনাশিনী হতেই হত, যদিও আজ উলটো কথা জানতে হচ্ছে। হাঁটাপথে তোলা-মেথরের এই যাত্রাপথ ছিল আট-দশ মাইল। এই নোংরা কাজেরও যথেষ্ট চাহিদা ছিল পশ্চিমের অস্পৃশ্য মানুষের কাছে।

শুচিবায়ুগ্রস্ত নাগরিকেরা এদের কাজে লাগলেও এরা ছিল অশুচি, অপবিত্র। শহরকে অমল রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা করলেও শহুরে জীবনের ভাগীদার এরা নয়। এমনকী এদের বাসাও ঠিক করা ছিল শহরের নির্জন, পরিত্যক্ত অঞ্চলে। প্রেতপুরীর প্রেতেরা যেন রাতের অন্ধকারে নোংরামি সেরে তাদের নিষিদ্ধ পল্লীতে আত্মগোপন করত। ১৮৬৩ সাল থেকে ১৭৭৫ সালের মধ্যে পৌরপিতারা এই ব্যবস্থার সংশোধনে নানা আইনের আশ্রয় নিলেন। শহরের সুস্বাস্থ্য নিয়ে যে ভাবনা-চিন্তার শুরু, তা মূলত মহামারীর প্রকোপ থেকে শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের সহযোগীদের নিরাপদ করার জন্য। প্রথম দিকে যে ব্যবস্থা নেওয়া হল তা শুধু ওই মেথরদের উপর চোট-পাটের চেষ্টা। তারা রাতের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সারবে। রাস্তার ছধারে ময়লা ছড়াবে না বা যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলবে না। যখন ময়লা নিষ্কাশনের পয়ঃপ্রণালী হল, তখন শুধু তাতেই ময়লা ফেলবে। ক্রমশ য়ুরোপীয় ও ভদ্রলোকের বাড়িতে ঐ নালার সঙ্গে যুক্ত নিকাশি নল বসানো হল। সরাসরি এই ব্যবস্থার ফলে ওইসব বাড়ি থেকে ময়লা তোলা বা ফেলার জন্য আর মেথরের বা তোলা-মেথরের দরকার হল না। এই ব্যবস্থা চালু রাখতে নতুন কর বসানো হল। সম্পন্ন লোকেরা কর দেওয়ার বর পেলেন। কালো কলকাতার ঘুঘ্নু পল্লীতে, ঘরে এবং বস্তিতে এই ব্যবস্থা পৌঁছল না। সেখানে কাঁচা রাস্তা, কাঁচা ঘর, কাঁচা নালী। সেই নালীতে নিজেরাই নিজেদের জনজাল জলাঞ্জলি দেয়। সেইসব নালা, গর্ত জীবাণুর আস্তাকুঁড়, নরকের কুণ্ড হয়ে দাঁড়ায়, মহামারী ছড়ায়। অবশেষে সরকার সেদিকেও দৃষ্টি ফেরালেন। বহু বস্তি এলাকা ভেঙে জমি ভরাট করে নতুন নিকাশি নালার পত্তন হল, শহরের চেহারা খানিক ফিরল, কিন্তু সেইসব জমিতে উঠতি ধনীরা বাড়ি করলেন। যারা একদিন জীবনপণ করে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাস করত, তারা পরিবর্তনের চাপে পিষ্ট হল। যে মেথর সম্প্রদায় এতদিন সব শ্রেড-জনজালে নিজেদের নিমগ্ন রেখে নাগরিক স্বাস্থ্য বজায় রেখেছে হঠাৎ এই একপেশে পৌর ব্যবস্থায় দিশেহারা হয়ে পড়ল এদের পুনর্বাসনের কথা পৌরপিতারা চিন্তাও করলেন না। যাঁরা এই আংশিক পরিবেশপরিচর্যায় বঞ্চিত হয়ে মেথর-ধাঙড়দের বহাল রাখতে চাইলেন, তাঁদের উপর জরিমানা জারি হল। মেথরেরা কথায়-কথায় গ্রেপ্তার হতে থাকল, পিটুনি খেল, পিটুনি থেকে রেহাই পেতে অর্থদণ্ডও দিল।

তাই এল ধর্মঘট—প্রথমবার ১৮৭৭ সালে। পৌরপিতা মেটকাফ এই ১৫০০ জন অনিয়ন্ত্রিত, বিশৃঙ্খল মানুষের উপর এক হাত নিলেন। এরা অন্যায়ভাবে মলনিকাশের নতুন ব্যবস্থা প্রতিহত করছে, নাগরিকদের উপর চাপ দিয়ে মজুরি আদায় করছে আর নিষিদ্ধ জায়গায় ময়লা ফেলে পরিবেশ দূষিত করেছে, রোগ ছড়াচ্ছে। সরকার ৬২৫ টাকা খরচে একজন পরিদর্শক, তার ছজন সহকারী আর মেথরের দল নিয়ে আইনবদ্ধ পৌরনিকাশি ব্যবস্থা চালু করলেন।

পুরনো মেথরের দল এই বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী বিদ্রোহ করল। ২রা এপ্রিল ১৮৭৭, সর্দারদের ডেকে স্পষ্ট বলা হল লাইসেন্স ছাড়া মেথররা ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারবে না। সর্দারদের দায়ী করা হবে এবং কথা না শুনলে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হবে। ঐতিহাসিক সংগ্রাম শুরু হল। সেই একদিন রাত্রেই কর্মবিরতি হল। পৌরকর্মীদের নিরস্ত করা হল শহরের বস্তি অঞ্চলে, শহরতলিতে, হাওড়ায়, যেখানে পৌরব্যবস্থা চালু হয় নি সেখানেও হরতাল পালিত হল। লাল এবং ঘাসী, ছুই সর্দারের নেতৃত্বে এই হরতাল চূড়ান্ত সফল হল। ছুশো নতুন মেথর নিয়ে আর ময়লা ফেলার গাড়ি নিয়ে স্বয়ং পৌরস্বাস্থ্যপরিদর্শক এর মোকাবেলা করতে পারলেন না। সংবাদপত্র সমালোচনায় মুখর হল। "বেঙ্গলী"তে সুরেন্দ্রনাথ লিখলেন, তাড়াহুড়ো করে পৌরসংস্থা







ময়লা ফেলার কাজ কুক্ষিগত করতে গিয়ে এখন সপ্তাহে একদিনও শহর সাফাই হচ্ছে না। পুতিগন্ধময় হয়ে উঠছে। তবু সরকার জিদ ধরে রইলেন। নতুন নিকাশি বিভাগ চালু হল। তাদের জমাদার, চৌকিদার, পরিদর্শক তদারক করতে লাগল।

প্রায় হাজার জন নতুন মেথর নেওয়া হল। করও চাপল নতুন করে। কিন্তু তবু সরকারের জিত হয় নি। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে, মহামারীর ভয়ে নিজেদের স্বার্থে যে অকুলান ব্যবস্থা সচ্ছল নাগরিকদের উপর কর চাপিয়ে চালু করার চেষ্টা হয়েছিল, ধীরে-ধীরে সেই ব্যবস্থার খোলসের মধ্যে পুরনো মেথরদের অনুপ্রবেশ ঘটল, তাদের স্বাধিকারও অনেকটা মেনে নিতে হল, ঘৃণিত উপেক্ষিত হয়েও যারা সমাজের এই হীনতম বৃত্তি অবলম্বন করে একটা ন্যূনতম নিকাশি ব্যবস্থা শহরের সর্বস্তরে বজায় রেখেছিল, বীজাণু-কবলিত হয়ে যারা অকালে অচিকিৎসায় প্রাণ হারাত, তাদের উদ্দেশ্যপ্রণোজিত নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে গিয়ে পৌরসংস্থা ব্যর্থ হয়েছিল।

কিন্তু প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরেও এই ধর্মঘটের ফল হিসেবে মেথর সম্প্রদায়ের বৈষয়িক উন্নতি বিশেষ হয় নি। ১৯২৮-এর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, কর্পোরেশনের খাতায় ঝাড়ুদার ৫০৩৭ জন, মেথর ১৮৫৯ জন আর ঠেলাওয়ালা ১৬৯৯ জন। ঝাড়ুদার, ঠেলাওয়ালার মাস মাইনে ১৪ টাকা আর মেথর পায় ১২ টাকা। শহরতলিতে এই মজুরি নেমে ঝাড়ুদারের ৮-১২ টাকা, মেথরের ১১-১৩ টাকা আর ঠেলাওয়ালার ১২ টাকায় দাঁড়ায়। এই মজুরি ৬০-এর দশকে এসেও ৩০ টাকার বেশি হয় নি। জিনিসের দাম শতগুণ চড়া সত্ত্বেও। সেই সঙ্গে চাকরির কোনো নিরাপত্তা নেই। ওরা কাজ করে। মারী নিয়ে ঘর করে। মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে আস্তাবল, গোয়ালঘর বা স্যাঁতসেঁতে ৬ বাই ৭ ফুট অন্ধকার ব্যারাকের খোপ। ৬০ জনের জন্য একটা পায়খানা। অবর্ণনীয় ক্লেদাক্ত পরিবেশ, জলসরবরাহ প্রয়োজনের চেয়ে ঢের কম। যারা বস্তিতে বাস করে তারা বোধহয় সরকারি ব্যারাকের চেয়ে ভালোভাবে থাকে। এই ছুঃসহ অবস্থায় ক্ষিপ্ত হয়ে মাঝে-মাঝে বালতি ঝাড়ু ফেলে দিয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বইকি। ১৮৭৭-এর ঐতিহাসিক ধর্মঘটের পরে মাঝে-মাঝে ছোটো-খাটো ধর্মঘট করেছে মেথরেরা, ১৯২৮-এও এমনটি ঘটেছিল। অতি ন্যায্য দাবিতে। ৩০ টাকা মাস মাইনে, আলো-হাওয়া-জল-নিত্যকর্মের ব্যবস্থা সমেত মানুষের উপযোগী বাসস্থান। কিন্তু পৌরকর্তারা এই মানবিক অধিকারের দাবিকে উপেক্ষা করে সেই আগের মতো আগন্তুক মানুষদের নিয়োগ করে আন্দোলন ভেঙে দিতে চাইলেন।

পুলিশ তলব করা, ধরপাকড়—কিছুই বাদ গেল না। কিন্তু এমনই প্রয়োজনীয় মেথরের কাজ যে একটু রুখে দাঁড়ালেই শহর পুতিগন্ধময় হয়ে ওঠে। দাবির কিছুটা আদায় হয়। এরকম ধর্মঘট ১৯৩৭, ১৯৪০, ১৯৪৪-৪৬-এও মেথরেরা করেছে। সাম্প্রতিক কালেও নজির আছে, কিন্তু সমস্যা এদের মেটে নি। এত আবশ্যিক কর্মীরা কেন তাদের ন্যায্য মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে গেল ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

## গাড়োয়ান-ঠেলাওয়ালা

নীচুতলার বাসিন্দা নগরের প্রান্তিক পরিজন আরেক গোষ্ঠী হল গাড়োয়ান-ঠেলাওয়ালা। এই বাজার-গঞ্জের শহরে মালপত্রের আনাগোনায় প্রধান বাহন। লরি, টেম্পো সেদিনের ব্যাপার, তাও খরচসাপেক্ষ। তাই অতি আবশ্যিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত গাড়োয়ান-ঠেলাওয়ালা শহর সচল রাখার প্রধান শরিক। কিন্তু এদেরও বিড়ম্বনার অন্ত ছিল না। বেশির ভাগ গাড়োয়ানই পশ্চিমের মানুষ; বিহার, উত্তরপ্রদেশ এমনকী রাজস্থান থেকেও ভেসে এসেছে। এদের অনেকেরই নিজের ঠেলা বা মোষ ছিল না বা

থাকলেও একটি।

ঠেলা বা মোষের মালিক চৌধুরীদের কাছ থেকে এগুলো ভাড়া নিয়ে এসে দিনমজুরির প্রাণান্তকর প্রয়াস। ১৯৩০-এর এক হিসেবে এই মোষে-টানা ঠেলাগাড়ির সংখ্যা কলকাতায় ২০ হাজারেরও বেশি। এদের দৈনিক আয় ৪ টাকা মাত্র যেখানে একটা মোষের পরিচর্যার খরচ মাসে ৪০ টাকা। চৌধুরীকে তার প্রাপ্য দিয়ে আর কী-ই বা থাকে! তবু তাই এদের রুজির উপায়। মোষগুলোর সঙ্গে খাটালে একসঙ্গে রাত কাটায়। এই যে সামান্য জীবিকার নিরাপত্তা, তাতেও টান পড়ল। পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির কিছু শাসকবর্গীয় সদস্য হঠাৎ মোষেদের কষ্টে ক্লিষ্ট হয়ে এমন আইন জারি করালেন যে শিবঠাকুরের আপন দেশেও তেমনটি নেই। এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে অর্থাৎ গরমকালে ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত মোষেদের বিশ্রাম দিতে হবে। আর যেমন তেমন মালও বওয়ানো যাবে না। ওজন বেঁধে দেওয়া হবে। মোষেদের কষ্টলাঘবের এ ছাড়া আর কী উপায়! একই সঙ্গে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের অধীনে বেঙ্গল চেম্বার অভ কমার্স এবং পোর্ট ট্রাস্টও এর প্রতিধ্বনি তুললেন। অথচ বেচারা গাড়োয়ানদের মালখালাসের প্রধান সময় তো ওইটাই। ওই মাসগুলোতে কি ওরা নিরন্ন যাবে? এ যে মানুষের চেয়ে মোষের জন্য দরদ উথলে ওঠার ওজর!

গাড়োয়ানদের বিকল্প ব্যবস্থা কী হবে? আসলে মোষদরদিরা গাড়োয়ানদের হটিয়ে দিয়ে মোটরলরির আমদানি করতে চান, বিশ্বমন্দার দরুন গাড়ির নতুন বাজার পেতে চান। স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ীরা তাদের মালচলাচলের জন্য গাড়োয়ানদের উপর নির্ভরশীল এবং এটা পারস্পরিক। গাড়োয়ানদের নাজেহাল করে আসলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মালপত্র লেনদেনের সুলভ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার অপচেষ্টা এটি। কিন্তু গাড়োয়ানদের হয়ে লড়বার জন্য কেউ ছিল না সেদিন। বৃহত্তর সমাজ ছিল এ ব্যাপারে উদাসীন।

তাই তারা নিজেরাই সংগ্রামে নামল। ১৯৩০-এর গাড়োয়ান ধর্মঘট নামে যা প্রসিদ্ধ। এই ধর্মঘটের অন্যতম সংগঠক আবদুল মোমিন এর বিবরণ নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন। ধর্মঘট শুরু হবার আগের ছ মাসের মধ্যে নতুন আইন মানার জন্য চৌধুরী-গাড়োয়ানদের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং অন্যথায় ধর-পাকড় জরিমানা চলতে থাকে। ১৯২৯-এর এক হিসেব থেকে "স্টেটসম্যান" লিখল, ১৯৪৬৫টি আইন-লঙ্ঘনের কেসে ১৯৩৯৫ জনের জরিমানা হয়েছে। তার পরিমাণ ১,৭৬,৫৯৫ টাকা। প্রায় সব গাড়োয়ানই দণ্ড দিয়েছে। অথচ এই টাকার মোটা অংশ পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি তার সাংগঠনিক কাজে ব্যয় করেছে, মোষের সেবায় লাগে নি।

উৎসাহিত হয়ে আইনের পরিসীমা সেপটেমবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। আরো অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আর ফোর্ডের প্রাপ্তি কলকাতার রাস্তায় বাড়তির দিকে। ১৯৩০-এর ১লা এপ্রিল তাই ধর্মযুদ্ধ ঘোষিত হল। পৌরপিতাদের মধ্যে সহানুভূতিশীল মদনমোহন বর্মন উপায়ান্তর না দেখে চটকল মজদুর য়ুনিয়নের বঙ্কিম মুখার্জী আর আবদুল মোমিনের সঙ্গে গাড়োয়ানদের যোগাযোগ করিয়ে দেন। এইভাবে প্রথমোক্তকে সভাপতি এবং দ্বিতীয় জনকে সম্পাদক করে গাড়োয়ানদের ইউনিয়ন গড়া হয়। ১৯৩০-এ সারাভারতে আইন অমান্য আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়ে যায় গাড়োয়ান ধর্মঘট। এর আসল নায়ক গাড়োয়ানদের নেতা কিশোর সিং, রাজা সিং, রাম নাগিনা সিং আর চৌধুরীদের তরফে রাজারাম সিং, দীপনারায়ণ সিং, আল্লাবকস। ঐতিহাসিক পয়লা এপ্রিল, ১৯৩০, বেলা বারোটায় ধর্মঘট শুরু করার কথা। কিন্তু অধীর, স্বতঃস্ফূর্ত গাড়োয়ানেরা ১০-৩০ থেকেই হাওড়া ব্রিজের মুখে তাদের মোষের জোয়াল খুলে দিয়ে ঠেলাগুলো আড়াআড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। সেইসঙ্গে পাকাপোক্ত ব্যারিকেডের জন্য ময়লা ফেলার টিন, ইটপাথর, মালপত্র যা পাওয়া গেল ফাঁকে-ফোকরে জমা হল। মালচলাচলের প্রধান সংযোগস্থলে এই ব্যারিকেড ব্যাবসার জগতের প্রাণ-স্পন্দন যেন থামিয়ে দিল; বড়োবাজার, শোভাবাজার, লালবাজার, বৌবাজার, ধর্মতলা, মৌলালি, আহিরীটোলা, চিৎপুর, খিদিরপুর—সবদিকে যানজট হয়ে কলকাতা বেহাল হয়ে গেল। তখন পুলিশ নামল ব্যারিকেড সরাতে। গাড়োয়ানদের উপর লাঠিবাজি হল। তার উত্তরে ইটপাটকেলের বৃষ্টি। এমন খোলাখুলি রাস্তার লড়াই এত ব্যাপকভাবে আর দেখা যায় নি। পুলিশ-প্রধান টেগার্ট একে সবচেয়ে তীব্র দাঙ্গা আখ্যা দিয়েছেন। সন্ধে পর্যন্ত লড়াইয়ের শেষে সরকার আলোচনায় বসতে এবং কিছু দাবি-দাওয়া মানতেও নিমরাজি হলেন, কিন্তু মোষদের বিশ্রামের সময় সংক্ষিপ্ত করতে রাজি না হওয়ায় ধর্মঘট চলল 'চতুর্থ দিন পর্যন্ত। কিছু ছাত্র, দোকানি, পথচারী পুলিশের গুলিতে নিহত হল, তাদের শবযাত্রা বার হল। ক্রমশ আরও ছাত্র, দোকানদার, পথচারী, মজদুর কুলি এবার শামিল হল। একটা ফাটল পেলে অনেক চাপা আগুন একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। কলকাতায় অভাগারা এক গোত্রের।

তেমনি চলল অশ্বারোহী পুলিশের অত্যাচার। প্রধান নেতারা গ্রেপ্তার হলেন, য়ুনিয়ন অফিস তছনছ করা হল।

গাড়োয়ান ধর্মঘটের দুটো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। চূড়ান্ত অধ্যায়ে এর নেতৃত্ব দিয়েছেন মদন বর্মন, স্বামী বিশ্বানন্দ, গড়বোলে, বঙ্কিম মুখার্জি, আবদুল মোমিন, খালেক প্রমুখ নানামতের রাজনৈতিক নেতা, আর হিন্দু-মুসলমান গাড়োয়ান-চৌধুরীরা একসঙ্গে এই আন্দোলন করেছেন। ব্যারিকেড দিয়ে শহর বিপর্যস্ত করার অভিনব কৌশল ও তার শক্তি পুলিশ কর্তৃপক্ষকেও বিচলিত করেছে। শেষ মীমাংসায় গাড়োয়ান গোষ্ঠী মোষের বিশ্রামের সময় কিছুটা কমিয়ে দেবার দাবি আদায় করেছে। মোষের মোটের ভারও নির্দিষ্ট করা হয়েছে আপোসে। ধরপাকড় জরিমানার রেহাই মিলেছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য বাণিজ্য-সংস্থা গুদাম আরো সকাল থেকে খোলা রাখার প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। এই বা কী কম লাভ। কিন্তু মূল প্রশ্নের সমাধান হয় নি। আধুনিক পরিবহণের সূচনা হলে গাড়োয়ান হঠে যেত ঠিকই। কিন্তু সেই পুনর্বাসনের প্রশ্ন। কলকাতার তথা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ সুষ্ঠু হলে বিকল্প কাজে লাগতে পারে উদ্‌বৃত্ত গাড়োয়ান। কিন্তু ঔপনিবেশিক অর্থনীতি খুবই সঙ্কীর্ণ খাতে চালিত হয়েছে, তাই মোটর-লরি গাড়োয়ান আর তার ঠেলাগাড়িকে চাপা দিতে চেয়েছে। এখনও লরি, টেম্পো, ঠেলাগাড়ি একই সঙ্গে বর্তমান। বড়ো জোর, গোরুর গাড়িতে টায়ারের চাকা আর হেড লাইট লেগেছে, তার বেশি নয়। স্বাধীনতার পরেও অবস্থান্তর বিশেষ ঘটে নি। ১৯৫২-র লাইসেন্‌স্ আইনে টায়ার-লাগানো গাড়িতে ৪-১০ টাকা পর্যন্ত ফি চাপানো হয়েছে ৪০ টাকার সাধারণ ফির উপরে। তাই আবার তিনদিনের জন্য ধর্মঘট করেছে গাড়োয়ানেরা। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।

### রিকশাওয়ালা

নীচুতলার বাসিন্দাদের মধ্যে যাদের বিশ্বজোড়া অখ্যাতি তারা রিকশাওয়ালা। এই তো সেদিন কাগজের খবর, জনৈক বিদেশী যুবক সদর স্ট্রীটে একটি রিকশাচালকের রিকশা নিজে টেনে তার কায়ক্লেশের ভাগ নিচ্ছিল। এও যেন ক্রুশবিদ্ধ যীশু বা ক্রীশ্চান পেনিটেন্স বা পার্গেটরির নবরূপ। শীতে উপেক্ষিত পিতামাতা, অনাথ শিশু, মানসিক রোগী, নেশাতুর, দেহ-ব্যবসায়ে দীর্ণ মানুষের বেদনাময় জগৎকে ছাপিয়ে ক্লিষ্ট মানুষের কিংবদন্তীর নায়ক কলকাতার রিকশাওয়ালা। দোমিনিক লাপিয়েরের আনন্দনগরের প্রধান চরিত্র। হাজারে-হাজারে এই

হিউম্যান হর্স বা মানুষ-ঘোড়া শহরে ভিড় করেছে, সেই একই গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে অভাগার স্বর্গ কলকাতায়। যেখানে প্রায় বিনা পুঁজিপাটায় এবং দক্ষতায় কিছু রোজগার এবং থাকাখাওয়া সম্ভব। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত অবাঙালি শক্তিধর মজুরই রিকশা টানত। কিন্তু ১৩৫০-এর মন্বন্তরের পরে বাঙালি রিকশাওয়ালাও কম নেই। এদের বেশির ভাগেরই নিজের রিকশা নেই। সাধারণত বাঙালি মধ্যবিত্ত বা মাড়োয়ারি-পানজাবি ব্যবসায়ী রিকশা কিনে এদের রোজের হিসেবে চালাতে দেন। চালকেরা প্রধানত মুসলমান বা নীচুজাতের। চৌধুরীরা যেমন গাড়োয়ানদের গার্জেন, এইসব বাবুরাও তেমন রিকশাওয়ালার কর্ণধার। চালক যোগাড়, ঘণ্টার হিসেবে মোট কাজ আর তার মজুরির নির্ধারক। প্রভুর হিসেব মিটিয়ে এখানেও তাই চালকের কোনো রকমে ডালভাতের সংস্থান হয়। দিনে তো দেখি ছাতুর মণ্ড, কাঁচালঙ্কা দিয়ে গেলার আকৃতি। ১৯৭০-এর এক খতিয়ানে গড়ে দৈনিক ৩ টাকা থাকত একজন চালকের হাতে। রোজ সমান যেত না। মালিকরা রিকশা সারাইয়ের দায়িত্ব, পুলিসি হাঙ্গামা মোকাবেলা চালকের উপর দিয়ে খালাস। ১৯৭১-৭২-এর এক সমীক্ষায় ১০০ জন রিকশাওয়ালার মধ্যে ৩৬ জন কাঁচাঘরের বাসিন্দা, বাকিরা ফুটপাথের। কিছু গ্যারাজে, খাটালে আর ভাগ্যবান কেউ-কেউ পাকাবাড়িতে। আরো ভাগ্যমন্ত বস্তিতে ঘরভাড়া করে পরিবার রাখে। চূড়ান্ত দারিদ্র্য, হতাশা এদের ঘিরে। তাই ১৯০৮-এ এরাও ইউনিয়ন গড়েছে। যখন গোরা পুলিসের হাতে রিকশাওয়ালা নিগৃহীত হয়ে দেখল সমাজে কেউ তাদের হয়ে লড়বার নেই, তখন তারা সংঘবদ্ধ হল নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নির্ধারণ করবে বলে। দমদম, টালা, উল্টোডাঙা, তিলজলা, যাদবপুর, টালিগঞ্জ অঞ্চলের সাইকেল রিকশা-চালকদের মধ্যে এক সমীক্ষায় (১৯৮৫) দেখা গেছে, ১৫-২০ বছরের কিশোর থেকে আরম্ভ করে ৫৫-৬০-এর প্রৌঢ়রাও রিকশা চালায়। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, ২৪-পরগনা, বাংলাদেশের উদ্বাস্তু, বিহার, উত্তর-প্রদেশের ভাগ্যান্বেষী এরা।

অনেকে এই শহরেই রিকশা চালিয়ে বড়ো হয়েছে। তারা হয় কৃষক নয় শ্রমিক, নয় সামান্য চাকুরে পরিবারের। জাতিতে প্রধানত তপশিলী, মুসলমান। তার পরেই, কিছু কায়স্থ, এক-আধজন ব্রাহ্মণ-বৈদ্যও আছে। ৪০০ জন রিকশাচালকের মধ্যে ১২৫ জন ৫ম-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। বেশ কিছু অষ্টম শ্রেণী পাস, কেউ স্কুল টপকে কলেজে পা দিয়েছে। কারিগরি শিক্ষা নিয়েও কেউ-কেউ অন্য কাজ না পেয়ে রিকশা টানে। মানুষ হিসেবে হীনম্মন্যতায় ভুগলেও এদের এখনও সামাজিক মূল্যবোধ বেঁচে আছে, দায়িত্ববোধ আছে। শতকরা ২১ জন টাকা জমিয়ে, ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ে রিকশার নালিক। কিস্তি শোধ দেয় যথারীতি। তবু চালক-মালিক-চড়নদারের মধ্যে বিলক্ষণ ব্যবধান এবং বিরোধিতা আছে। দুপক্ষেরই মানসিক পরিবর্তন দরকার। রিকশা চালনা স্বাধীন পেশা, তার মর্যাদা আছে।

### কলকারখানার শ্রমিক, শিশুমজুর

কলকাতার কলকারখানার শ্রমিকরাও নীচুতলার বাসিন্দা। তাদের অনেক সমীক্ষা হয়েছে। শুধু শিশুমজুরের কথা বললেই এদের জগৎ সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে।

স্ত্রীমজুর বা শিশুমজুরের চাহিদা আছে যথেষ্ট। এটা কোনো আশ্রয় দেবার বা অনুকম্পা দেখাবার তাগিদে নয়। কম মজুরিতে বেশি খাটানো যাবে, বেশি বাধ্য হবে, বিদ্রোহ করবে না, এসবই মালিকের মানসিকতায় কাজ করেছে। শিশুমজুর বলতে আমরা নাবালক ভৃত্য বা খাবারের দোকানের কর্মীদের বুঝি। তারা ১২-১৪ ঘণ্টা যাবতীয় ফাইফরমাশ খাটে, মজুরি পায় রোজ ২ টাকা, মাসে ৬০ টাকার মতন,







গালাগাল খায় দেশজ ভাষায়। মালিকের পা টেপে এবং সেই পায়ের লাথিও জোটে কপালে। ব্যতিক্রম আছে, তবে সেটা কখনই রীতি নয়। ১৯৭১-এর সুমারিতে সারা ভারতে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ১০.৭৪ মিলিয়ন, জনসংখ্যার শতকরা ৫৯ ভাগ। ভাবলেও অবাক হতে হয়। এরা সুস্থ, সবল মানুষ হবে কবে আর লেখাপড়াই বা শিখবে কখন! ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হচ্ছে মাতৃক্রোড়, যৌথ পরিবার, বিদ্যালয়—ভালোবাসার ঠাঁইগুলি থেকে ছিন্ন হয়ে এরা যে নিষ্ঠুর অমানুষ হয়ে উঠবে। অন্ধকার নৈরাজ্যে ঝাঁপ দিয়ে ভাঙচুরে মেতে উঠবে। শিশু ভোলানাথ গুণ্ডা খোঁদন হতে আর কতক্ষণ! কলকাতার দোকান, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মিষ্টির দোকানের ৮০০ জন শিশুমজুরদের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে দারিদ্র্য, গৃহবিবাদ আর দেশ-ভাগ মিলিয়ে শিশুমজুরের হার ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা থেকে এরা বেশি এসেছে। বয়েস ছয় থেকে শুরু করে ২৫ পর্যন্ত। বহিরাগতদের মধ্যে বিহার থেকে সবচেয়ে বেশি—২৬ শতাংশ। ৮-১০ জনের বড়ো পরিবারের বাড়তি শিশু বাবার পিটুনিতে বা মা-বাবার কলহে বিক্ষিপ্ত হয়ে, বাড়ি থেকে পালিয়ে, ট্রেন ধরে সোজা কলকাতায় চলে এসেছে। শুধু ধর্মতলায় জুতোপালিশে মগ্ন শিশুদেরই দেখুন না। এখানে এসেও শান্তি নেই। দাদার অত্যাচার, মজুরিতে চোট। নইলে জুতো পালিশের সরনজাম ধারে মিলবে না বা নিজের থাকলে কাড়া হবে। সিনেমার টিকিট লাইন লাগিয়ে ধরতে হবে দাদারা পরে চড়া দামে বেচবে বলে। পকেট কাটতে হবে এক আধলা কমিশনের বিনিময়ে। অবর্ণনীয় ব্যাপার। সম্প্রতি "সালাম বম্বে"তে কিছু দৃশ্য ধরে রাখা হয়েছে। কলকাতার পক্ষেও প্রযোজ্য। গড়ে এদের মাসিক আয় ৫০ টাকা, বোমবাইতে ৬০-৬৫ টাকা। অনেক সময় বিনা মাইনেতে বা ১০ টাকা মাসমাইনেতে শিশুমজুরকে রেখে পুরোদমে খাটিয়ে নেওয়া হয়। ১২-১৪ ঘণ্টা কঠোর খাটুনির পর নানা নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে এরা বিড়ি খায়, চণ্ডুচরস খায়, জুয়া খেলে, চোরাচালান দেয়, চুরি করে, দু-একটা খুনও করে। ১৯৭৯-র শিশু অপরাধীদের এক খতিয়ানে দেখা যায়, ৪৪৩৯ জন অভিযুক্তর মধ্যে ২৭৬৯ জন নানা পেশায় যুক্ত ছিল। সিঁড়ির নীচে, চাপা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে, এক চিলতে বারান্দায়, রান্নাশেষের রান্নাঘরে, দোকানের কোনায়, টেবিলের তলায় নচেৎ ফুটপাথে পিঠ ঠেকাতে পেলে বর্তে যায়। শতকরা ৪৫-৪৬ জন ফুটপাথে রাত কাটায়। এদের নিয়েও ইউনিয়ন হয়েছে, কাজের সময় ৮ ঘণ্টায় বাঁধা হয়েছে, মনুমেনটে সভা হয়েছে, শিশুজনস্ফীতে অধিকার-অর্জনকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। শিশুমজুরের বয়েস ১৫ বছরে বেঁধে দিতে চাইলেও ভারত সরকার তা করতে পারেন নি।

১২-১৬ বয়সের শিশুদের নিয়োগ রদ করা যায় নি দুঃস্থ পরিবারের কথা ভেবে। কিছু সমাজকল্যাণ সংস্থা এদের অবৈতনিক শিক্ষা দিতেও এগিয়ে এসে-ছেন। তবু মূল সমস্যার সমাধান হয় নি। প্লাস্টিকের কারখানায় কর্মরত শিশুমজুর প্লাস্টিকের টুকরো জোড়ার ফাঁকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, সে নিজেই জানে না। কেউ তার খবর রাখে নি।

### ফুটপাতের বাসিন্দা

সবশেষে সর্বহারাদের কথা। কলকাতার ফুটপাথ দিনে দোকানপাট আর রাতে বারোয়ারি বিছানা হয়ে ওঠে। কারা এই বাস্তুহারা ফুটপাতের বাসিন্দা? ১৯৭৩-৭৪-এর এরকম ১০,০০০ জনের এক সমীক্ষায় পাওয়া তথ্য এরকম: ঠিকে দিনমজুর ২১.২%, পরিচারিকা ৬.১%, ভিখারি ২.০৫%, রিকশাওয়ালা ৬.৮%, ঠেলাওয়ালা ৬.৩%, কাগজকুড়ুনি ৪.৯%, পাকা দিনমজুর ৩.৩%, সবজিফলওয়ালা ৫.৩%, ফিরিওয়ালা ১.৬% বাকি বিশ্বকর্মারা ২৪.২%। এদের

মধ্যে ক্ষণিকের অতিথি থেকে আরম্ভ করে ৪০/৪৫ বছর ধরে স্থায়ী বাসিন্দারও দেখা মেলে। ১৩৫০-এর দারুণ দুর্ভিক্ষে যেন সমস্ত গ্রামবাঙলার নিরন্ন মানুষ উঠে এল কলকাতার ফুটপাথে। তারপর বাঙলাভাগ। দলে-দলে উদ্বাস্তুদের ভিড় শিয়ালদার প্ল্যাটফর্ম থেকে শহরের ফুটপাথে। কলকাতা হয়ে গেল ঝুপড়ির শহর, অভাগার স্বর্গ। তবে বিশ শতকের শুরু থেকেই কলকাতা গাঙ্গেয় উপত্যকার একমাত্র রুজি-রোজগারের কেন্দ্র হিসেবে কয়েক লক্ষ মানুষকে ফুটপাথে ঠাঁই দিয়েছে। নিজে উঁচুতলার মানুষের কাছে দুঃস্বপ্নের, মিছিলের নগরী বলে অভিহিত হওয়া সত্ত্বেও। ভিখারির মিছিল শুধু খোরাকির আশায় অলিতে গলিতে কাজ খুঁজেছে, ভাগ্যমন্তরা ১-২ টাকায় দিনমজুর হতে পেরে ধন্য হয়েছে। ৬ আনার মজুরির খবর পেয়ে ধেয়ে গেছে গরিব ফুটপাথের বাসিন্দা। কলকাতার বহুতল প্রাসাদ ঘিরে রয়েছে বস্তি আর ঝুপড়ি আর তারই গাড়িবারান্দার নীচে বা খোলা ফুটপাথে বাউণ্ডুলেদের কুকুরকুণ্ডলী। এদের আয়ের চেয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় বেশি। দিনমজুর উপরন্তু রিকশা টানে, রমণী পতিতা হয়। শিশু দোকানে দাসখত লেখায়, জুতোপালিশ করে বা চোর-ছ্যাঁচোড় হয়। এ শুধু ঔপনিবেশিক অর্থনীতির জের নয়, আধুনিক দুমুখো অর্থনীতিরও পরিণতি।

ফুটপাতের জগতে অনেক পুরুষ-মহিলা জীবনে একক। জীবনের স্বাভাবিক স্বাদ পায় নি এরা। তাই অবৈধ সম্পর্ক, অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা। নেশায়-সুরায় গ্লানি ঘোচাতে চায়। বহু বছর ঘুরে গেলেও এদের ভাগ্যচক্র ঘোরে না বলে বিষণ্ণ, বিবিক্ত। উঁচুতলা-নীচুতলায় যোজনব্যাপী মানসিক দূরত্ব। অথচ এদেরই পরিশ্রমে উঁচুতলার জীবন আরামের হয়, মসৃণ হয়। সারাদিন উঁচুতলার সেবায় দিন কাটিয়ে নিজেদের হীনম্মন্যতায় ময়চৈতন্য এই অপাংক্তেয় মানুষের দল।

বস্তির কথা দিয়ে শেষ করি। বস্তির একখানা ঘর যে সংগ্রহ করতে পারে, পরিবার রাখতে পারে, সে তো মাটির ঘরে চাঁদ নামিয়ে এনেছে। এই বস্তি কেমন? অতীতে ছিল মাটির দেওয়াল, বেড়ার বেড়, খড়ের ছাউনি। লটারি কমিটির টাকায় যখন সাদা কলকাতার প্রাসাদপুরী চৌরঙ্গির সৃষ্টি হল, তখন সেখানকার ঝুপড়ি-বস্তির মানুষকে উৎখাত করে বউবাজারে, বৈঠকখানায় ছুঁড়ে দেওয়া হল নতুন বস্তিতে। সেখানে অহরহ অগ্নিকাণ্ডে নাজেহাল অভাজনদের জীবন। আবার জমিদারি মুৎসুদ্দিগিরির টাকায় যখন বাবুগৌরবের কালো কলকাতায় সৌধগুলি মাথা চাড়া দিল, তখনও অভাগারা মাথা গুঁজল ওই বাবুদের ভাড়া দেওয়া বস্তিতে। বস্তি আর বাজার পত্তন করলে ভালো রোজগার হয়। ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে ব্যাবসা-বাণিজ্যে ভাটা পেয়ে বাবুরা আয় বাড়াবার এই উপায় বার করলেন। গরিব মানুষেরা এখানে থাকবে আর তাঁদের সেবা করবে। এইভাবে বস্তির জন্ম। ধারাবাহিক ইতিহাসের দরকার নেই। শুধু বর্তমানের অবস্থা নজর করলেই যথেষ্ট। এই সেই আলোকবাতাসহীন অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে অন্ধকূপ, হলওয়েল বাস্তব হয়ে ওঠেন। কাঁচাঘর আগে ছিল অনেক বেশি, এখন কিছু পাকা হয়েছে। ১৯১৭ সালে কলকাতায় বস্তির সংখ্যা ৫৯৯০, ১৯৬০-এ ৩২৭২। নাবাল জমিতে কোনোরকমে খাড়া করা হয়েছে। বর্ষাকালে মেঝেতে পাশের নোংরা নালার জল উঠে আসে। খাবার জলের ব্যবস্থা নেই। হয়তো গঙ্গা-জলের কল আছে একটা, নইলে পাশের পানাপুকুরে প্রাত্যহিক সব কাজ সারা হয়। বহু জনের জন্য একটা খাটা পায়খানা। সে নরক অবর্ণনীয় অথচ নোংরামির জন্য গাল খায় অভাগার দল—বস্তির মালিক বা পৌরপিতারা নয়। কারখানার শ্রমিকের শতকরা ৮০ ভাগ বস্তিতে বাস করেছে। ১৯৫৮-৫৯-এর সমীক্ষায় এই তথ্য জানা যায়। তারপরে হয়ত কুলি লাইন বা মজুরদের কোয়ার্টার কিছু তৈরি হয়েছে। তারা তো স্বর্গের বাসিন্দা। ৩-৪ জন সদস্যের মজুর পরিবারমাত্র একদেড়খানা ঘরে জীবন কাটায়। স্বামী-স্ত্রীর আলাদা হবার উপায় নেই। প্রতি ২৬ জনের জন্য একটি পানীয় কল। প্রতি ১৪-১৫ জনের জন্য একটা পায়খানা। যেখানে কুলি লাইন সেখানেও ৭০ জন একটা কল ব্যবহার করে। এই পঙ্কিল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রায়ই মহামারী হানা দেয়। যে-কোনো প্লেগ, কলেরা, বসন্তের খতিয়ানে বস্তির অর্ধেকের বেশি বাসিন্দা কবলিত। এমনকী ১৯৫৮র এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ৫৯ জন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত অথচ চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। পৌরপিতা বা বাবুসমাজ সমান উদাসীন। খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ, কাশীপুর, রাজাবাজার, উল্টোডাঙা, কলাবাগানে বস্তির ছয়লাপ। ওয়ার্ডের হিসেবে ১৯-২১, ২৫-২৯, ৩২ নম্বর।

বহু জাতি, ভাষা, বর্ণ, বৃত্তি মিলিয়ে কলকাতার বস্তির, ঝুপড়ির, ফুটপাথের বাসিন্দারা একজাতি, একপ্রাণ। শহরের অভাজন।

ওরা উঁচুতলাকে ধরে রাখে আবার চুরি, ডাকাতি, লুঠ, চোরাচালান, জুয়ো, দেহ বিক্রয় করে। দাঙ্গা-খুনেও শামিল হয়। পয়সা পেলে, খোরাকি পেলে মিছিল করে, সমাবেশে সংখ্যা বাড়ায়। যে-কোনো কুকাজ করে। দাঙ্গার ইতিহাস বা গুণ্ডাদের ইতিহাস যাঁরা রচনা করছেন, তাঁরা হদিশ পেয়েছেন, যে-কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা, তা সে সাম্প্রদায়িক হোক আর অসাম্প্রদায়িক হোক, রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক হোক অথবা নিছক নৈরাজ্যের তাণ্ডব হোক, একযোগে ফাঁক-ফোকর থেকে, অলিগলি থেকে বেরিয়ে পড়ে চোর, ভিখারি, মজুর, গাড়োয়ান, রিকশাওয়ালা, জুতোপালিশ, ফেরিওয়ালা, ঠেলা-ওয়ালা, সামান্য দোকানি—পুঞ্জীভূত ক্রোধে ধ্বংসের খেলায় মেতে ওঠে। শুধু শাসক নয়, শোষক নয়, নিজেরই নির্বেদে নিজেকে চুরমার করে দিতে উদ্যত হয়। যে জীবন তারা যাপন করে, সে কি অভাগার স্বর্গ না নরকের কুণ্ড! জীবনের গ্লানির অবসান চায়। আগ্নেয়গিরির চূড়ায় চড়াইভাতি করতে-করতে উঁচুতলা মাঝে-মাঝে কোন কাঁপন অনুভব করে কি? তিন মিনিটের কাঁপনে কত প্রাসাদময়ী নগরী ধূলিসাৎ হয়েছে ইতিহাসে। মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে, সকলের সাথে অন্নপান ভাগ করে নিতে নতুন করে ভাবতে হবে এই প্রজন্মকে।

---


সহায়ক গ্রন্থ

১. Calcutta in the 20th Century—Moniman-jari Mitra ( অবিলম্বে প্রকাশিতব্য )

২. লেখকের প্রকাশিতব্য "বাঙলা চালচিত্রে কলকাতা"।

৩. Report on the Survey of Ten Thousand Pavement Dwellers in Calcutta, 1977-78 – Sudhendu Mukherjee.

৪. Muslims of Calcutta, 1974 ; Aspects of Society and Culture in Calcutta, 1982—M. K. A. Siddiqui.

৫ Calcutta : A Quest for 1988—Network Research Bureau.

৬. Glimpses of the History of Calcutta, 1600-1800—Rama Deb Ray.

৭. সোশিও-ইকনমিক রিসার্চ ইনসটিটিউট-এর রজতজয়ন্তী আলোচনাচক্রে পঠিত প্রবন্ধাবলী, ১৯৮৫।

৮. "কলকাতার শিশুশ্রমিক"— স্বপন সিংহ।

৯. "কলকাতা ও শহরতলির রিকশাচালকদের অবস্থা"— সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

# সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

## রবিবাসর

**হরপ্রসাদ মিত্র**

"রবিবাসরের আসরে" বইটির ( ৩ বৈশাখ ১৩৯৬ ) মুখবন্ধ লিখেছেন বর্তমান সর্বাধ্যক্ষ শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক এবং তিনি তাঁর তিন পৃষ্ঠার ওই মুখবন্ধর নাম দিয়েছেন "রবিবাসরের আলেখ্য-দর্শন"। 'আলেখ্য'-ই বটে, তবে মূল বইটিতে আলেখ্যের তুলনায় বিবিধ তালিকা তৈরির দিকেই ঝোঁক বেশি পড়েছে বলে মনে হতে পারে। কত রকম প্রসঙ্গ এই ষাট বছরের সাহিত্যিক, সংগীত ও চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, সাংবাদিক, অধ্যাপক প্রভৃতি গুণিজনের মিলন-সভায় ঘটেছে, রবিবাসরের হীরক-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত এই বইটিতে সেই বৈচিত্র্যের পরিচয় আছে।

"ভারতী", "মানসী", "মানসী ও মর্মবাণী", "কল্লোল", "শনিবারের চিঠি", "বঙ্গশ্রী", সুধীন্দ্রনাথ দত্তের "পরিচয়", বুদ্ধদেব বসুর "কবিতা" ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার আসরের মতো "রবিবাসর" কিন্তু কোনো বিশেষ পত্রিকা-কেন্দ্রিক আসর নয়। ১৩৩৬ সালের কার্তিক মাসে "মানসী ও মর্মবাণী"-র কর্মাধ্যক্ষ সুবোধচন্দ্র দত্তের বাসভবনে এক সাহিত্যসভা স্থাপনের পরামর্শ-সভা বসে এবং তারপর ৮ই অগ্রহায়ণ ( ২৪ নভেম্বর ১৯২৯ ) সেই ৫ নম্বর আশুতোষ মুখার্জি রোডে "মানসী"-সম্পাদক ও কথাসাহিত্যিক সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রবিবাসরের প্রথম অধিবেশন হয়। তখনকার প্রবীণতমদের অন্যতম "ভারতবর্ষ"-সম্পাদক জলধর সেন, "আনন্দবাজার পত্রিকা"র প্রফুল্লকুমার সরকার, "যমুনা"র ফণীন্দ্রনাথ পাল, "প্রবাসী"র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এবং আরো সব স্বনামধন্য ব্যক্তি রবিবাসরের সঙ্গে যুক্ত হন। পূর্বোক্ত পরামর্শ-সভাতেই স্থির হয় যে, সাহিত্য-অনুরাগীদের এই সভায় ৫০-এর বেশি সদস্য নেওয়া হবে না,—প্রতি পক্ষান্তে রবিবার বিকেলে কোনো সদস্যের বাসস্থানে সভা বসবে। প্রথম বছরে কলকাতায় এবং হাওড়ার কয়েক জায়গায় আসর বসে। ১৫ শ্রাবণ ১৩৩৭ তারিখে প্রবাসী-প্রেস থেকে সজনীকান্ত দাস আট পৃষ্ঠার এক 'নিয়মাবলী' ছেপে বের করেন, যাতে দেখা যায় ওই সময়ে প্রত্যেক সদস্যের প্রদেয় মাসিক চাঁদা ছিল আট আনা এবং রাজনৈতিক আলোচনা ছিল নিষিদ্ধ। ওই নিয়মাবলীতে তখনকার মোট ৪০ জন সদস্যের তালিকায় পূর্বোক্তেরা ছাড়া ছিলেন রাজশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর বসু, সতীশচন্দ্র মিত্র, নীলমণি চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ বসু, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, গোপাল হালদার, চারুচন্দ্র মিত্র, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, মন্মথনাথ ঘোষ, সুহৃৎকুমার মিত্র, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। কার্যনির্বাহক - সমিতিতে ছিলেন ১২ জন। পরের বছরেই কিন্তু ওই কার্যনির্বাহক-সমিতি বাতিল হয়ে যায়। অতঃপর স্থির হয়—'সর্বাধ্যক্ষ মহাশয়ের নির্দেশমত সম্পাদক কর্তৃক রবিবাসরের সাধারণ সকল কার্য নির্বাহিত হয়। বিশেষ কার্যাদির ব্যবস্থা সভার অধিবেশনে নির্ধারিত হইয়া থাকে।' এইভাবে ৩৭ বছর কেটে যায়।

**রবিবাসরের আসরে**—সন্তোষকুমার দে। প্রাপ্তিস্থান: ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬। ৩রা বৈশাখ, ১৩৯৬। তিরিশ টাকা।







তারপর ১৩৭৩ সালে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সর্বাধ্যক্ষ, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং সর্বাধ্যক্ষের নির্বাচিত চারজন সদস্যকে নিয়ে নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

প্রথম 'সর্বাধ্যক্ষ' হন জলধর সেন ( কার্যকাল ১৩৩৬ থেকে তাঁর জীবনাবসান চৈত্র, ১৩৪৫ অবধি ); দ্বিতীয়, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ( ১৩৪৬ থেকে তিরোধান ২৪ আশ্বিন ১৩৬৮ পর্যন্ত ); তৃতীয়, নরেন্দ্রনাথ বসু ( কার্তিক ১৩৬৮ থেকে ৩০ চৈত্র ১৩৭০ ); চতুর্থ, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ( বৈশাখ ১৩৭১ থেকে ১৬ ফাল্গুন ১৩৭৬ ); পঞ্চম, নরেন্দ্র দেব ( চৈত্র ১৩৭৬ থেকে জীবনাবসান ৫ বৈশাখ ১৩৭৮ অবধি ); ষষ্ঠ, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ( বৈশাখ ১৩৭৮ থেকে তিরোধান ২৫ আষাঢ় ১৩৯৩ অবধি ); সপ্তম ও বর্তমান সর্বাধ্যক্ষ শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক ( ৩০ শ্রাবণ ১৩৯৩ থেকে )।

কালানুক্রমে রবিবাসরের সম্পাদক-তালিকা এই —প্রথম, নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ( ১৩৩৬ ); দ্বিতীয়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৩৩৭ ); তৃতীয়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ( ১৩৩৮-৪০ ); চতুর্থ, নরেন্দ্রনাথ বসু ( ১৩৪১-৪৪ ); পঞ্চম, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ( ১৩৪৫-৪৬ ); ষষ্ঠ, পুনরায় নরেন্দ্রনাথ বসু ( ১৩৪৬-৬৮ )—অর্থাৎ তিনি সম্পাদক ছিলেন মোট সাতাশ বছর; সপ্তম, তিনকড়ি দত্ত ( ১লা পৌষ ১৩৬৮ থেকে ১৬ই আষাঢ় ১৩৭০ অবধি )—এবং অষ্টম, শ্রীসন্তোষকুমার দে ( ২২ আষাঢ় ১৩৭০ থেকে অদ্যাবধি )।

শরৎচন্দ্রের অশ্বিনী দত্ত রোডের ( তখনকার মনোহরপুকুর রোড ) বাড়িতে তাঁর আমন্ত্রণে সপ্তম বর্ষের সপ্তম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ যোগ দেন ৩রা শ্রাবণ ১৩৪৩। শরৎচন্দ্রের গাড়ি নিয়ে গিরিজাকুমার বসু তাঁকে আনতে যান। রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানান স্বয়ং শরৎচন্দ্র এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি উপস্থিত সকলেই। জলধর সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বছর-দুয়েকের বড়ো। তাঁকে দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেন—'এই যে, জলধর-দাদাও রয়েছেন দেখছি।'

এই সভায় রবীন্দ্রনাথ রবিবাসরের 'অধিনায়ক' পদ গ্রহণ করেন, "বলাকা" থেকে 'তুমি কি কেবলই ছবি' আবৃত্তি করেন এবং তাঁর ভাষণে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন—'যতদিন তোমাদের এই "রবিবাসর" বেঁচে থাকবে ততদিন তোমরা এর ভিতর দিয়ে দেশের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করবে, উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে দেবে। কাকেও নিরাশ হতে দেবে না, অলস হতে দেবে না, দেশের কাজকে ও সমাজের কল্যাণকে বড়ো করে লোকে দেখতে পারে এমন একটা প্রেরণা তোমরা সমাজের বুকে, দেশের বুকে ছড়িয়ে দেবে।'

২৫ আশ্বিন ১৩৪৩ বেলিয়াঘাটায় অনিলকুমার দের 'প্রফুল্ল-কাননে' রবিবাসরের বার্ষিক উদ্যান-সম্মিলনেও রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এবং শরৎচন্দ্রের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশে দীর্ঘ আশীর্বাণী পড়ে শোনান যাতে বলা হয়—'সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে, চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি।'

আবার ৩০ ফাল্গুন ১৩ ৩ রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে কলকাতা থেকে জলধর সেনের নেতৃত্বে চল্লিশজন সদস্য শান্তিনিকেতনে "উত্তরায়ণে"র অধিবেশনে উপস্থিত হন। রবীন্দ্রনাথ ওই সাহিত্য-সভার পরে তাঁদের শ্রীনিকেতনের কাজ দেখতে পাঠান। বলেন —'আমার জীবনের অনেক দিন নগরের বাইরে পল্লী-গ্রামের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি।' তাঁর গ্রাম-সংস্কারের নানা প্রয়াসের উল্লেখ করেন তিনি। বলেন—'আমাকে এখানে আপনারা বিচার করবেন কবিরূপে নয়, কর্মীরূপে।'

রবিবাসরের সদস্য-তালিকা ষাট বছরে সুদীর্ঘ হওয়াই স্বাভাবিক। লেডি রাণু মুখার্জি, আনন্দবাজার পত্রিকার প্রফুল্লকুমার ও অশোককুমার সরকার ও চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, মন্মথনাথ ঘোষ, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, দেবীপদ ভট্টাচার্য, রমা চৌধুরী, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি বহু স্রষ্টা, শিল্পী ও সাহিত্যানুরাগী সদস্য ছিলেন।

অজস্র ব্যক্তিনাম, অধিবেশনের বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ, ৩৯-৪০ পৃষ্ঠায় রবিবাসরের প্রসঙ্গ আছে যে-সব প্রবন্ধে-নিবন্ধে সেরকম ৫১টি রচনার তালিকা, —এবং নানা অনুষ্ঠানের হ্রস্ব-দীর্ঘ বিবরণ তথ্যানুসন্ধানী পাঠককে অভিভূত করবে। অনেকে প্রয়াত, নতুন-নতুন সদস্য সমাগত, —এবং কালীকিঙ্করের আমলে সদস্য-সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৫২ করা হয়। প্রফুল্লকুমার সরকারের "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" ও "জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ"—জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের "বিশ্ব-ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ",—অজিতকৃষ্ণ বসুর "যাদু ও সাহিত্য" এবং আরো কোনো কোনো লেখকের কোনো কোনো প্রবন্ধ-নিবন্ধ রবিবাসরের প্রেরণায় রচিত। তাছাড়া সাহিত্য, সমাজ ও শিল্প-প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী রবিবাসরের আসরে বিশেষ বিশেষ সদস্যের আনুকূল্যে দেখানো হয়েছে, যেমন "ইনডিয়ান মিরর", "বন্দে মাতরম্", "সঞ্জীবনী", "হিতবাদী" প্রভৃতি পত্রিকার ফাইল,—রবীন্দ্রনাথের লেখা শ্রীঅরবিন্দের একটি বইয়ের ভূমিকা (কোন্ বই? বিশদ উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। পৃ. ৭৮), ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত প্রদর্শিত লনডনের ফুটপাথে পাওয়া নোবেল-কমিটিতে পাঠানো ইংরেজি "গীতাঞ্জলি"র প্রথম সংস্করণের এক কপি,—আশাপূর্ণা দেবীর পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্তের আঁকা কয়েকটি ছবির ছাপা কপি যেগুলি আশাপূর্ণাকে উপহার দিয়েছিলেন শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীসুধীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রদর্শিত বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, সুভাষচন্দ্র প্রমুখের চিঠির পাণ্ডুলিপি, হুগলী জেলার গ্রামে পাওয়া টেরাকোটার মূর্তি, প্রথম যুগের পোস্ট-কার্ড, কোনো কোনো বাঙলা বইয়ের প্রাচীন প্রথম সংস্করণ,—লেডি রাণু মুখার্জিকে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের উপহার ইত্যাদি।

বাঙলা বানান-সংস্কার,—বাঙলা ভাষায় টেলিগ্রাফ, বাঙলা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হোক্,—'বন্দে-মাতরম', পূর্ণাঙ্গভাবে ভারতের জাতীয় সংগীত হোক্ ইত্যাদি ইচ্ছা ও প্রয়াস রবিবাসরের হৃদয়ে জেগেছে মাঝে-মাঝে, কিন্তু দেশের নেতারা এসব ব্যাপারে বিশেষ আমল দিয়েছেন বলে মনে হয় না। বানান-সংস্কারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশেখর বসু প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির শুভ প্রয়াস অবশ্যই স্মরণীয়। তবে লেখকরা যতক্ষণ রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর, সুনীতিকুমার প্রভৃতির বক্তব্য আন্তরিক প্রযত্নে না মানছেন ততক্ষণ স্থায়ী কোনো কাজের কাজ হবে কি?

পরিশেষে আনন্দবাজার পত্রিকার সরকার-পরিবারকে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়, কারণ তাঁরাই সুদীর্ঘকাল রবিবাসরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খরর ছেপে আসছেন। ১৩৪৩ থেকে সংগৃহীত এইসব খবরের সারাংশ অবলম্বনে সন্তোষকুমার এই বইটির অনেকটাই লিখেছেন। কিন্তু কোনো-কোনো উল্লেখযোগ্য আসরের অনুল্লেখ চোখে পড়ল। সে অবশ্য সন্তোষ-বাবুর নিজস্ব রুচি ও অভিপ্রায়। কিন্তু তুচ্ছ ও দুর্বোধ্য কিছু-কিছু মুদ্রাকর-প্রমাদ না ঘটলেই ভালো হত, যেমন পৃষ্ঠা ২৯-এর তৃতীয় অনুচ্ছেদে সার উইলিয়ম জোন্স্ নামে,—পৃষ্ঠা ১১৫-এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় লাইনে চপলাবাবুর 'পাণ্ডিত্যের





পরিচয় নাই' হবে 'পাই', —পৃষ্ঠা ১৪৯-এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের তৃতীয় লাইনে 'কলীনরো' কি 'কুলীনগর'? এরকম আরো অনেক তুচ্ছ ভুল পাঠকরাই শুধরে নিতে পারবেন। কিন্তু বাঙলা অঙ্কে ৫৩ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে "ড. ভবতোষ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা)" গুরু প্রমাদ—স্বামীজীর এক ভাই ছিলেন 'ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত'—মনে হয় ছাপাখানার ভূতের উৎপাতেই তিনি হয়েছেন 'ভবতোষ'।

### ভ্রমনিরসন

জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত "মহাভারতকথা" প্রবন্ধে কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে।

| পৃষ্ঠা | কলম | পঙক্তি | শুদ্ধ রূপ |
|---|---|---|---|
| ১৭৯ | ১ | ১ | পৃথ্বীর |
| ১৮০ | ২ | ৩২ | কার্পেনিয়ন |
| | | ৩৩ | কাসপিয়ন |
| ১৮১ | ১ | ১২ | সগডিয়ানা |
| | ২ | ৩ | ব্রীহিযব |
| | | ৩১ | প্লক্ষদ্বীপ |
| ১৮২ | ১ | ৩ | গুগিন |
| | ১ | ৮ | অনু, ত্বষ্ট্ |
| ১৮৩ | ১ | ১১ | হিমালয় অঞ্চলে কোথাও কোথাও |
| ১৮৪ | ১ | ২৬ | তিনি শ্বেত বা গৌরবর্ণ |
| | ১ | ৩৪ | শম্বুক |
| ১৮৫ | ১ | ২৩ | পরে প্রজাপতি |
| ১৮৮ | ২ | ১৭-১৮ | চ্যোরনি নিকলাই |
| ১৯২ | | ১ | 'চীকোপেত।' "কৃষ্ণচরিত্র", বঙ্কিমচন্দ্র |

# একটি অন্বেষণ

**সুরজিৎ ঘোষ**

সদ্যপ্রয়াত সুধীর সেনের আলোচ্য বইটি আত্মজীবনী বা স্মৃতিচারণার ঢঙে লেখা হলেও আসলে তা একটি বিশেষ অর্থ নৈতিক দর্শনেরই প্রকাশ।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির এত উন্নতি সত্ত্বেও বিশাল-সংখ্যক মানুষের দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান মনুষ্যত্বের যে স্থায়ী অপমান সূচিত করে, লেখক কলম ধরেছেন মূলত সেই অবস্থারই বিরুদ্ধে। এই বইটি দারিদ্র্যের সেই ভয়াবহ সমস্যা সমাধানের একটি সূত্র তুলে ধরবার অন্বেষণ চালিয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত খাদ্য-জনসংখ্যাবৃদ্ধি-ক্ষুধার আক্রমণকে পর্যুদস্ত করার এক পন্থায় উপনীত হতে চেয়েছে। পন্থাটা সরল একটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত: তা হল, প্রতিটি উন্নতিকামী দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ সুষ্ঠুভাবে বর্তমান বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যবহার করা। কিন্তু এই সরল কাজটি বাস্তবে করে ওঠা যে সহজ নয়, তা যেমন আমরা জানি, লেখকও তা জানতেন।

কুড়ির দশকে শ্রীসেন গান্ধীজির অহিংসামন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন; তিনি খদ্দর পরাও শুরু করেন অর্থ নৈতিক স্বাদেশিকতার প্রতীক হিসাবে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হওয়ার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি লন্ডনে যান এবং সেখানেও সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। যৌবনেই এই প্রতিভাদীপ্ত ছাত্রটির মনে প্রশ্ন জাগে: 'আমরা কি অন্য দেশগুলির সমস্যার দিকে কেবল ইংরেজদের চোখ দিয়ে তাকাচ্ছি না?' তাই যদি হয়, তবে সে তাকানো একদেশদর্শী হতে বাধ্য। সংশয়ের বশবর্তী হয়ে তিনি বন শহরে চলে যান, এবং স্নাতকোত্তর কাজ করেন সেখানেই অধ্যাপক Joseph Schumpeter-এর সঙ্গে; বিখ্যাত অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কিও শ্রীসেনের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন।

অধ্যাপক Schumpeter-এর পরামর্শে শ্রীসেন কাজ করেন "আন্তর্জাতিক স্বর্ণ আন্দোলনের" উপর যার বিশেষ প্রসঙ্গে এসেছিল তৎকালীন ফ্রান্সে দ্রুত স্বর্ণসঞ্চয় গড়ে ওঠার কারণ এবং ফলাফল। এই গবেষণা-পত্রটি জর্মন ভাষায় প্রকাশ করার মানসিক তাগিদে শ্রীসেন গভীর উৎসাহে সেই ভাষা শিক্ষা করেন। এই গবেষণা শেষ করার পরে তিনি ব্যক্তিগত গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের কারণে লনডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ ফিরে আসেন ১৯৩৬-এ। ১৯৩৯ সালে দীর্ঘ দশ বছর পড়াশুনো-গবেষণার পর তিনি ভারতে ফেরেন ২৬ জানুয়ারি। এবারে তাঁর সামনে রইল দুটি কাজ, যা তাঁর ভাষাতে বলতে গেলে বলতে হয় 'Now I had two poverty problems to work on —my own and of the country.'

১৯৩৮-এ মিলানে থাকার সময়ই তিনি রবীন্দ্রবন্ধু লিয়োনার্ড এলমহার্স্টের আমন্ত্রণ পান এবং তার ফলেই দেশে ফিরে শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ইনসটিটিউট অব রুরাল রিকনস্ট্রাকশন-এ যোগ দেন। এই পর্বে ভারতীয় গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড় হয়, এবং তাদের সমস্যার প্রকৃত রূপটা বুঝতে তিনি সচেষ্ট হন। তিনি খাদি এবং হ্যানডলুম শিল্পের সমস্যা নিয়েও কাজ করেন এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আর বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে তাঁর গবেষণার ফলাফল জানান। ১৯৪২ সালে আকস্মিকভাবে তাঁকে দিল্লী যেতে হয় এবং নলিনীরঞ্জন সরকারের ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে কাজ করতে হয়। এই কাজের এক বছর সময় তাঁর কাছে কেমন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে ২৬ পৃষ্ঠায়।

১৯৪৩। এই বছরটি শ্রীসেনের জীবনে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার বছর। তখন তাঁকে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের অর্থ নৈতিক স্ট্যাটিসটিশিয়ান হিসাবে নিয়োগ করা হয় এবং খাদ্যশস্য-পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি ক্ষুধার জ্বালায় লক্ষ-লক্ষ লোকের মৃত্যুর নীরব সাক্ষী হতে বাধ্য হন। যদিও এ অবস্থা তাঁর পূর্বঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণীকেই সমর্থন করেছিল, তবু রাজনৈতিক দাবাখেলায় মানুষকে এমন অসহায়ভাবে দুর্ভিক্ষে মরতে দেখে শ্রীসেনের অসহ্য বেদনা হয়, এবং অর্থনীতিবিজ্ঞানের উপরেই তাঁর বিশ্বাস কেঁপে যায়।

এই আস্থাহীনতার সময়েই এক দুর্গম প্রান্ত থেকে এসে পৌঁছয় নতুন আশার আলো। ডেভিস 'লিলিয়েনথালের'-এর "Tennese Valley Authority"-র উপর বইটি তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে, যার তিন কপিমাত্র এসেছে ভারতে। শ্রীসেন তারই একটির দুর্লভ প্রাপক। এই বইতেই শ্রীসেন পেলেন তাঁর প্রার্থিত "মেসেজ"—প্রাকৃতিক সম্পদই মানুষের সৌভাগ্যসাধনের একমাত্র পথ। মাটি, জল, খনিজ পদার্থ, অরণ্য, সূর্যালোক বা বাতাসের মতো সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের মধ্যেই আছে মানুষের অগ্রগতির বীজ।

এই প্রত্যয় থেকেই জন্ম হল ভারতীয় TVA-র। দুর্ভিক্ষের পরের সংকট-বছরে যখন এলমহার্স্ট কলকাতায় এলেন কৃষি উপদেষ্টা হিসেবে, তখন তাঁর সাহায্যে যুক্ত হলেন শ্রীসেন এবং কাজ শুরু হল দামোদর প্রকল্পের। ৫৫ কোটি টাকার আনুমানিক ব্যয়ের এই প্রকল্প থেকেই শ্রীসেনের জীবনের আর-এক অধ্যায়ের শুরু।

১৯৪৭-৪৮ সালে শ্রীসেনের সামনে এসে দাঁড়াল দ্বিবিধ সমস্যা। প্রথমত এই বিশাল প্রত্যাশাপূর্ণ প্রকল্পের অর্থ নৈতিক ভিত্তি ও পরিকল্পিত সুবিধা অর্জনের প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমালোচনার সম্মুখীন হওয়া, এবং দ্বিতীয়ত, এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত তিন সরকারকে, (বাঙলা, বিহার ও কেন্দ্র) বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিতে একমত করানো। অবশ্যই এর মধ্যে দ্বিতীয় সমস্যাটি রাজনৈতিক কারণে বেশি অসুবিধা-জনক, বিশেষত তখন বিহারে কংগ্রেস সরকার এবং বাঙলায় মুসলিম লীগ নেতৃত্ব থাকার ফলে। তবু যে শেষ পর্যন্ত দুপক্ষের সমঝোতায় একটি বিল পাশ হল, যাতে দামোদর উপত্যকা নিগম নামের আঞ্চলিক সংস্থা স্থাপনের কথা বলা হল, তার পেছনে শ্রীসেনের ভূমিকা বড়ো কম নয়। স্বাধীনতা এবং দেশবিভাগ অবশ্য এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার ব্যাপারটা কিছু পিছিয়ে দিল, তবু সিদ্ধান্তটাই ছিল প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ইতিমধ্যে পণ্ডিত নেহরুর আমন্ত্রণে শ্রীসেনকে মস্কো যেতে হল সেখানকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের অর্থ নৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে। তাঁর রাশিয়া বাসকালে শ্রীসেন অনেক পদস্থ সোভিয়েত অফিসারের সঙ্গে রাশিয়ার কৃষিব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নিয়ে আলোচনার সুযোগ পান। এইসব আলোচনার সময় শ্রীসেন ধরা-বাঁধা মার্কস-বাদী পথের বাইরেও কিছু-কিছু মন্তব্য করেছেন, কিন্তু প্রকৃত মার্কসবাদীর মতোই সোভিয়েত অফিসার তাঁর কথার ভেতরের প্রকৃত তথ্য ও যুক্তির সারবত্তাকে সম্মান জানিয়েছেন, তাঁর স্বল্পমেয়াদি রাশিয়াবাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতি স্তালিনের একটি শ্লোগানের সম্মুখীন হওয়ার অভিজ্ঞতা, যেখানে স্তালিন বলেছেন, 'Our aim is to combine American methods with Russian planning.' শ্রীসেনের মতে মার্কসবাদের প্রতি এই স্বচ্ছ ও বাস্তব-

**Wanderings: In Search of Solutions of the Problem of Poverty.** By Dr. Sudhir Sen. Macmillan India Limited. 1989. Pp 110. Rs. 75.

সম্মত দৃষ্টিভঙ্গিই রাশিয়ার সাফল্যের অন্যতম কারণ।

ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮—এ সুধীর সেন Knoxville-এ উপস্থিত হলেন, TVA-র কাজকর্ম ভালো করে অনুধাবন করতে। এইখানেই বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ড. হারকর্ট এ মর্গান-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। শিশুর-সারল্য-মাখা এই বিজ্ঞানীর মূল বিশ্বাসে সম্পদ দু ধরনের—সীমিত এবং অফুরান। গ্যাস, তেল ইত্যাদি সীমিত সম্পদের সুসমঞ্জস বিতরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, গ্রাম এবং শহরের মধ্যে ভারসাম্য রাখা—এই সবকিছুর উপরই যে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল তা তিনি বলেছিলেন। এর সঙ্গে শ্রীসেন যোগ করেছিলেন মানবসম্পদ ও তার প্রকৃত বিকাশের কথা। এই মানবসম্পদের যথার্থ ব্যবহারের অক্ষমতাই যে ভারতের মতো উন্নতিকামী দেশের অনেক ব্যর্থতার কারণ, তা বলতে ভোলেন নি শ্রীসেন।

উন্নতির সমস্যা প্রসঙ্গে TVA দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দিয়েছিলেন শ্রীসেন। কেননা, এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনের কথা বলে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি যে দামোদর উপত্যকা নিগমের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে বলে তিনি মনে করেন তাও আমরা জানতে পারি। কিন্তু ডি. ভি. সি-র ঋণ শুরু হল তার জন্মলগ্ন থেকেই।

আলোচ্য গ্রন্থের পরবর্তী দুটি অধ্যায় জুড়ে লেখকের ওই ডি. ভি. সি-র অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতা কেবল এক সরকারি চীফ এক্সিকিউটিভের নয়, সে অভিজ্ঞতা এক কঠিন অর্থনীতিবিদেরও। এই পর্বে তাঁর লড়াই, ঋণসংগ্রহ, নীতিগত পরিকল্পনা কাঠামো তৈরি করা, এবং শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ—সবই প্রায় উপন্যাসের মতো চাঞ্চল্যকর। একজন সৎ মানুষের অসহায়তা, সফলতার মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিকূল দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর অভিমানক্ষুব্ধ মনে সরে দাঁড়ানো, সবই এই অংশে ছড়ানো। সংহত অথচ অসামান্য সংবেদনশীলতায়।

অবশ্য ডি.ভি. সি পর্ব থেকেই সুধীর সেন আর-এক বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন। সেটা হল—ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্তির পর ভারতের উচিত তার নিজের স্বার্থে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হওয়া যাতে দারিদ্র্যের হাত থেকে ভারতবাসী মুক্তি পেতে পারে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু এটাই ছিল তখন থেকে তাঁর বিশ্বাস।

ডি. ভি. সি-র পর শ্রীসেন এলেন বোমবেতে, গ্রেট ঈস্টার্ন শিপিং কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার পদে। সরকারি পদ থেকে প্রাইভেট সেক্টরে আসার বদলটা খুবই বেশি। ভারতীয় জাহাজ ব্যাবসার নিজস্ব অসুবিধাগুলোকে সামনে রেখেই শ্রীসেন তাঁর কাজ শুরু করলেন এখানে। ১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকে গ্রেট ঈস্টার্ন-এর মাথায় 'লিবার্টি' জাহাজ কেনবার পরিকল্পনা আসে এবং শ্রীসেনকে আমেরিকায় পাঠানো হয় তারই আয়োজন করতে। কিন্তু জাহাজ কিনতে এসে শ্রীসেন নিজেই জড়িয়ে গেলেন অন্য আমন্ত্রণের জালে এবং যোগ দিলেন ইউনাইটেড নেশনস (U.N.)-এ। পরবর্তী এক দশকেরও বেশি সময় এই দায়িত্বেই তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয় নিউ ইয়র্ক, ঘানা, যুগোস্লাভিয়ায়, যে পর্বটি ভরা ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনায়।

হেডকোয়ার্টার নিউ ইয়র্কে প্রথম পাঁচ বছর (১৯৫৬-৬১) টেকনিক্যাল অ্যাসিসটান্স বোর্ডের প্রোগ্রাম শাখার ডিরেক্টর হিসাবে শ্রীসেন পাঁচটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। সীমিত সাধ্য সত্ত্বেও যতদূর কাজ করা যেত, কায়েমি স্বার্থের হাত তা করতে না দেওয়ায় তাঁর আশাভঙ্গই হয় শুধু। বরং পরবর্তী ঘানা পর্যায়ে তাঁর আন্তরিকতা ও কর্মক্ষমতা অনেক বেশি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। রাষ্ট্রপতি কে. নক্রুমার সঙ্গে তিনি যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেন, কিছুটা তারই দৌলতে ঘানায় বহু নতুন প্রকল্প শুরু করা যায়, যার কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিনিয়োগও এসেছে আভ্যন্তরীণ সূত্র থেকেই।







আসলে উন্নয়নই ছিল শ্রীসেনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন জনগণের প্রত্যেক প্রতিনিধির কাজ—রাজনৈতিক-ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বুঝিয়ে তাঁদের ক্ষমতা সাধারণের উপকারে লাগানোর চেষ্টা করা। তাঁর নিজের ক্ষেত্রে বরাবরই তিনি ভালো ফল পেয়েছেন, কেননা তাঁর বোঝানোর চেষ্টার ভিত্তি ছিল প্রকৃত তথ্য, যুক্তি, বিশ্বাস এবং ধৈর্য। তাঁর পরবর্তী সমস্ত কাজে, সর্বত্রই এই একই কারণে এসেছে সাফল্য, অবশ্যই ভিন্ন-ভিন্ন চেহারায়। পরবর্তী দায়িত্বে যখন তিনি UNDP-র প্রতিনিধি হিসাবে যুগোস্লাভিয়ার মতো আধুনিক (অনগ্রসর দেশগুলির মধ্যে) রাজ্যে আসেন, তখনও উন্নয়নের প্রতি তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। এখানে তাঁর পরিকল্পনার বিশেষ দিক ছিল ভূকম্পনপ্রযুক্তি। কিছুদিন আগেই ২৬ জুলাই ১৯৬৩-তে স্কোপজি ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়েছিল; সেই শহরের পুনর্নির্মাণের প্রকল্প দিয়েই এই কাজ শুরু। দ্বিতীয় প্রকল্প ছিল নদী উপত্যকার উন্নয়ন যার শুরুতে ছিল ভর্দার নদীর প্রকল্প। এই রাজ্যেও প্রেসিডেন্ট টিটো ও অন্যান্য সরকারি অফিসারদের সঠিকভাবে বুঝিয়ে শ্রীসেন ভূমি ও নগর উন্নয়নে প্রচুর স্থায়ী কাজ করতে সক্ষম হন। সফল হন পর্যটন, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নেও।

এরপর শিক্ষকতা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে এলেন সুধীর সেন, এই পরিবর্তনটা মানসিকভাবে প্রয়োজন ছিল তাঁর, যাতে তিনি পড়াশুনো ও চিন্তার সময় পান বেশি করে। এই অবসরে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ত্রিস্তর চিন্তা করেন তার দুটি ফসল ইতিমধ্যেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত: '*A Richer Harvest—New Horizons for Developing Countries*' এবং '*Repeating the Green Revolution—Food and Jobs for All*'. তৃতীয় খণ্ড '*Obligations of Affluence*' এখন প্রকাশের পথে।

শ্রীসেনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল: অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি কৃষি। যদি জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণে এবং কৃষির বিকাশে সঠিক দৃষ্টি দেওয়া যায়, তবে প্রাকৃতিক সম্পদের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগে উন্নয়ন সার্থক হতে বাধ্য। তাঁর অনুপম স্বচ্ছ ভাষা ও পরিষ্কার চিন্তার ফসল আলোচ্য বইটি।

অন্যদের কাছে এর মূল্য যে নেহাত কম হবে না, এই কৃশ বইটির প্রতি ছত্রে তার প্রমাণ রয়েছে। শ্রীসেনের প্রতিভা তাঁর নিজের মাতৃভূমিতে তেমন বিকাশের সুযোগ পায় নি—এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি একথাও সত্যি যে বিশ্বের বহু উন্নত আর অনুন্নত দেশে উন্নয়ন-অর্থনীতির কাজ করতে গিয়ে তিনি যে বিশাল জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তার সামান্য প্রয়োগেও উপকৃত হওয়ার সুযোগ রয়ে গেল আমাদের। বিশেষ করে উন্নয়নশীল ও উন্নতিকামী দেশগুলির পক্ষে, তৃতীয় বিশ্বের শরিকদের পক্ষে শ্রীসেনের বিশ্বাস ও উক্তি দীর্ঘস্থায়ী পাথেয় হয়ে থাকবে, যে বিশ্বাস প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ উন্নয়নের পথে এক নতুন অর্থনৈতিক সম্পদ গঠনের স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন দেখায় সমস্ত বিশ্বে আর্থ-সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার।

## বাঙলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা

**খাজিম আহমেদ**

আট শতকের প্রাথমিক পর্যায়ে আরব আর দশ শতকের শেষের দিকে তুর্ক-আফগান, ইরানি ইত্যাকার ইসলামধর্মী মানবগোষ্ঠী এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং বসবাস করতে থাকে। শ্রীহট্ট থেকে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত

**বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব**। সুখময় মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬। পঞ্চাশ টাকা।

তাদের অবস্থান ইতিহাসে স্বীকৃত। বাঙলায় ইসলামের উপস্থিতি আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। মুসলমানরা এদেশে এসেছিল একেশ্বরবাদের বাণী মুখে নিয়ে আর পণ্যবাহী সওদাগরের বেশে। বাঙলায় মুসলমান এসেছে তুর্কি ও আরবি ঘোড়সওয়ার হয়ে বিজেতার বেশে উত্তর-পশ্চিম থেকে, আর ব্যবসায়ীর পরিচয়ে ভারতসাগর হয়ে সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর-নগরে। সুফি-সন্ত আর দরবেশবর্গের আগমন ঘটেছে উভয় দিক থেকেই। মনে রাখা দরকার, বাঙলায় তুর্কি মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বন্দর-শহর চট্টগ্রামে আরব-বণিকরা এসে পৌঁছয়। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, সুলতান মামুদ নিরন্তর ভারতবর্ষ অভিযানের (৯৯৬ ১০৩০ খ্রী) মারফত উর্বরভূমি পানজাব দখল করে উত্তরভারত তথা এদেশীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার বিষয়টি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। এর পৌনে দুশো বছর পরে দ্বাদশ শতকের অন্তিম পর্বে 'পার্শো-টার্ক' ( Perso-Turks ) মুসলমান সুলতান মুহম্মদ ঘোরী দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে (১১৯২ খ্রী, হিজরি ৫৮৮) পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। পৃথ্বীরাজের এই পরাজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। মাত্র কয়েক বছর বাদে প্রখর সামরিক প্রতিভার অধিকারী ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী সুদূর বাঙলাদেশের পশ্চিম ও উত্তর অংশে মুসলিম রাজ্য স্থাপন করেন।

সুলতানি আমলের বাঙলার ইতিহাস রচনায় মাত্র তিনজন গবেষক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা হলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় [ "বাঙ্গালার ইতিহাস", দ্বিতীয় ভাগ—১৯১৮ খ্রী প্রকাশিত ], ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো [History of Bengal, Vol. II, প্রকাশ ১৯৪৮ ] আর ড. আব্দুল করিম [ বাংলার ইতিহাস— সুলতানি আমল,—১৯৭ ]। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় ভূমিকায় মন্তব্য করছেন, 'রাখালদাসই পরবর্তী গবেষকদের পথ-প্রদর্শক।'

সুলতানি আমলের বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে ইতিপূর্বে সুখময় মুখোপাধ্যায়ের দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম গ্রন্থ "রাজা গণেশের আমল" (১৯৫৫) এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ "বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল" (১৩৩৮-১৪৫৮) প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এ বইয়ের এ পর্যন্ত চারটি সংস্করণ হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি ("বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব",—১৯৮৮ সালে প্রকাশিত) বাঙলার ইতিহাস বিষয়ক তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ। বইটি ১২০৪ সালে বাঙলায় প্রথম মুসলমান বিজয় থেকে শুরু হয়েছে এবং দুশো-বছর-ব্যাপী স্বাধীন সুলতানদের আমল আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগেকার তাৎপর্যময় ঐতিহাসিক ঘটনার ( ১৩৩৮ খ্রী ) বর্ণনা দিয়ে শেষ হয়েছে। এই পর্বের অন্যদের রচনা ইতিমধ্যে কালবারিতে হয়ে পড়ায় এবং বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয় নি, এমন বিবেচনায় তিনি বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর উদ্দেশ্য, 'গবেষণার মধ্য দিয়ে আলোচ্য পর্বের পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করা।'

বাঙলায় 'রাজনৈতিক ইসলাম'-প্রতিষ্ঠার আদি পর্বের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গ্রন্থটিতে। গ্রন্থকার কিংবদন্তী, ভিত্তিহীন কল্পনা আর কুলগ্রন্থের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন নি মোটেই। তিনি মূলসূত্রগুলোকে সযত্নে বিশ্লেষণ করেছেন এবং এ যাবৎ কাল আবিষ্কৃত সমস্ত মুদ্রা ও শিলালিপি-গুলোকে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থের মূল উপাদান হচ্ছে মীনহাজ-ই-সিরাজের "তবকাৎ-ই-নাসিরী"। ইসামির "ফুতুহ্-উস-সলাতীন"-নামক গ্রন্থটিও তিনি কিঞ্চিৎ ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থকার ভূমিকায় স্পষ্ট উচ্চারণ করছেন, 'এই বইটি লেখার সময়ে যাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি, তিনি পাটনানিবাসী স্বনামধন্য পণ্ডিত জনাব সৈয়দ হাসান আসকারি।' এই-সমস্ত





বিশ্বস্ত সূত্রকে অবলম্বন করে নয়টি পরিচ্ছেদে বইটি রচিত হয়েছে। বিষয়গুলো হল : ১. ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী, ২. বখতিয়ারের অনুবর্তী শাসকবৃন্দ, ৩. দিল্লী থেকে প্রেরিত শাসকবৃন্দ, ৪. বলবন ও তাঁর বংশধরদের রাজত্ব, ৫. শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ, ৬. ফিরোজ শাহের পুত্রগণ ও তুঘলকী শাসন, ৭. পূর্ববঙ্গের হিন্দু রাজত্ব, ৮. ইতিহাসের অন্যান্য দিক, এবং ৯. বাংলায় অনুপ্রবেশকারী বহিরাগত মুসলমানগণ।

উপরোক্ত পরিচ্ছেদগুলোতে বাঙলায় প্রাথমিক পর্যায়ের ইসলামধর্মী শাসকদের পরিচয়, সামরিক জ্ঞান, সমাজ-আর্থ বিষয়ক পরিস্থিতি, দখলিকৃত রাজ্যসীমা, শাসনব্যবস্থা, তৎকালীন হিন্দু নৃপতিবর্গের অবস্থান এবং নিপীড়িত নিম্নবর্গের আর বর্ণের মানুষের প্রতি উচ্চবর্ণের অবহেলা, সর্বোপরি নির্যাতিত জন-গোষ্ঠীর ওপর সুফি-দরবেশবর্গের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনায় স্বচ্ছ ইতিহাসচিন্তার পরিচয় লক্ষ্যযোগ্য হয়ে উঠেছে। বাঙলায় ইসলাম-বিকাশ এবং মুসলিম অধিকারের আদিপর্বের ওপর লিখিত তাঁর পূর্বসূরী-দের রচনার অংশেষ সাহায্য নিয়েছেন; এটি সঠিক হলেও উক্ত মতবাদগুলোর সীমাবদ্ধতাও নির্দেশ করেছেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে নিজের মতটিও যুক্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন। এইখানেই আলোচ্য গ্রন্থটির অভিনবত্ব।

ইখতিয়ারউদ্দিনের বিহারজয়, নদীয়াজয় এবং লখনৌতিজয় সম্পর্কিত সময়নির্ধারণের প্রশ্নে ইতি-হাসবেত্তারা ভিন্ন-ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কুৎ-বুদ্দীনের সভাসদ হাসান নিজামীর "তাজ-উল-মাসির" আর "তবকাৎ-ই-নাসিরী"-র উক্তির সমন্বয় সাধন করে গ্রন্থকার স্থির করেছেন যে ইখতিয়ার ১২০৩ খ্রী বিহার জয় করেছিলেন এবং পরের বছর অর্থাৎ ১২০৪ খ্রী তিনি নদীয়া জয় করেছিলেন। গৌড় অর্থাৎ লক্ষণাবতী অধিকার করেন ৬০১ হিজরির ১৯শে রমজান অর্থাৎ ১০ মে ১২০৫ খ্রী। একথা এখন প্রামাণিকভাবে জানা গেছে ইখতিয়ারউদ্দিন খলজির একটি নবাবিষ্কৃত 'টঙ্ক' ( স্বর্ণমুদ্রা ) থেকে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় লিখছেন যে, এই মুদ্রা এ পর্যন্ত তিনটি পাওয়া গেছে; সেগুলো দিল্লী, লনডন ও ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে ( স্মিথসোনিয়ান জাদুঘরে ) রক্ষিত আছে। তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে উল্লেখ করেছেন ড. আহমদ হাসান দানীর গবেষণার বিষয়টি যেটি প্রকাশিত হয়েছিল *Indian Historical Quarterly*-তে ১৯৫৪ খ্রী। বখতিয়ার-কর্তৃক লক্ষণসেনের রাজধানী আক্রমণকে গ্রন্থকার 'surprise attack'-হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ১৮ জন অশ্বারোহীর বিষয়টি তাঁর কাছে আজগুবি বলে মনে হয় নি। তবে প্রাসাদ-আক্রমণের পরে বখতিয়ারের সমস্ত সৈন্য-বাহিনী যে নগরে প্রবেশ করেএবং নগরটি দখল করে —সেটিই গ্রহণযোগ্য বলে বিশ্বাস করেন। উপরন্তু, গ্রন্থকার লক্ষণসেনের পরাজয় সম্পর্কে ড. আব্দুল করিমের একটি বিশেষ মূল্যায়নকে সমর্থন করেছেন; সেটি হচ্ছে এই যে লক্ষণসেনের গুপ্তচরবাহিনী মোটেই দক্ষ ছিল না; তিনি শত্রুর গতিবিধির সংবাদ রাখতে পারেন নি।

রায় লখমনিয়া বা লক্ষ্মণসেনের অবস্থানের জায়গা হিসেবে যে 'নোদীয়হ' শহরের উল্লেখ "তবকাৎ-ই-নাসিরী"-তে পাওয়া যায় তার সঠিক স্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'কোন সন্দেহ নেই যে এটি বিখ্যাত নদীয়া বা নবদ্বীপ শহরের সঙ্গে অভিন্ন। ফারসি ভাষায় আমাদের 'অ'-র মতো কোনো ধ্বনি নেই, তার জায়গায় আছে, হ্রস্ব 'আ'। সুতরাং লেখাতে যা নোদীয়হ, উচ্চারণে তা 'নোদীয়াহ' অর্থাৎ নদীয়া।'

বখতিয়ারের জীবন চরম সার্থকতা এবং চরম ব্যর্থতার নজির বহন করে। বিহার, সিকিম এবং বাঙলা অভিযানে তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিরল সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেন। কিন্তু কামরূপ ভেদ করে সুদূর তিব্বত অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। হতাশাচ্ছন্ন বখতিয়ার নিতান্ত করুণ মৃত্যু বরণ করেন।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর মূল্যায়ন করেছেন এইভাবে, -'বখতিয়ার খলজীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাংলায় মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। বহুসংখ্যক মুসলমানকে তিনি এদেশে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা না হলে তিব্বত অভিযানের সময় দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করতে পারতেন না। তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ প্রভৃতি স্থাপন করে·· সমাজের কল্যাণ বিধান করেছিলেন; এজন্যও তিনি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। ···১২০৩-১২০৬ খ্রী—এই চার···ঝড়ের মত কাটিয়েছেন। ·· আসলে বখতিয়ার ছিলেন একজন চির অস্থির দুঃসাহসিক অভিযানকারী।'

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ইখতিয়ারুদ্দীনের প্রকৃত নাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী। কিন্তু মালিক ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী অর্থাৎ বখতিয়ারের পুত্র ইনি—এই মতের পক্ষেও যুক্তি রয়েছে। [ দেখুন, *The Oxford History of India*'—পৃ ২৩৬ এবং *An Advanced History of India*—পৃ ১৮৮ ]। এটি অবশ্য গৌণ বিষয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত তিনি আলোচনা করেছেন কিভাবে বাঙলায় ইসলামধর্মীর রাজত্ব প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর মতে, 'পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের অনেকাংশ শুরু থেকেই মুসলমানদের অধীন হলেও···পূর্ববঙ্গে অনেক দিন সেন বংশীয় রাজাদের শাসন ছিল।' সপ্তম অধ্যায়ে হিন্দু ও মুসলমান সূত্র মিলিয়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দু রাজত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর দাবি, 'যা ইতিপূর্বে কেউ করেন নি।'

অষ্টম অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন যে আলোচ্য পর্বটি হচ্ছে বাঙলায় ইসলামের সম্প্রসারণের যুগ। এই যুগে মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্য যেমন ক্রমে-ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তেমনি ইসলাম ধর্মও বিস্তারলাভ করছিল। হিন্দু সমাজের মধ্যে যারা নিপীড়িত, তাদের অনেকেই ইসলামের উদার সমাজ-ব্যবস্থা দেখে স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করল, "উচ্চ-বর্ণের" হিন্দুদের বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তা নারীরাও অনেকে মুসলমান হতে লাগল। বৌদ্ধদের একটি বিরাট অংশ ইসলামের আওতায় চলে এল। চট্টগ্রামে কিছু বৌদ্ধ অবশ্য আজও রয়েছে। কিয়দংশ হিন্দু হয়ে গেল। বস্তুত, ত্রয়োদশ শতকে বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল। এই যুগেই ইসলামের আসন স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। লেখক মন্তব্য করছেন, হিন্দুরা এই সময়ে উটপাখির নীতি অনুসরণ করে বাইরের এত বড়ো রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে চোখ বুজে ছিল এবং প্রাচীন কালের জীবন-যাত্রাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে দিনযাপন করছিল। আলোচ্য সময়ে উৎকীর্ণ ১২টি শিলালিপি পাওয়া গেছে। সেগুলো থেকে জানা যায় যে লখনৌতি রাজ্য 'ইক্তা', 'মোক্তা' আর 'ইকলিম'-নামক প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। ১২০৪-১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ১৩৪ বছরের সময়সীমার বৈদেশিক বিবরণ মাত্র দুটো পাওয়া গেছে। প্রথমটির লেখক মার্কো পোলো। দ্বিতীয় বইটি হচ্ছে ছাও-জু-কুআ রচিত "ছু-ফ্যান-চে"। বর্তমান গ্রন্থের লেখক যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি পেশ করেছেন উল্লিখিত বিবরণ থেকে।

বহিরাগত কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান সম্পর্কে নবম অধ্যায়ে বিশেষ গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়েছে। এঁরা হলেন: ১. কাজী রুকনুদ্দীন সমরখন্দী: "অমৃতকুণ্ড"-নামে যোগশাস্ত্র বিষয়ক একটি সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসি আর আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। বইটি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ২. মৌলানা তকীউদ্দিন আরবি: শাহ শোআইবের লেখা "মনাকিব অল-আশাফিয়া"-নামক গ্রন্থে এঁর সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। ৩. শেখ শরফুদ্দীন আবু তওয়ামাহ: ধর্মীয় নিবন্ধ রচনায় বিপুল দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি







ইসলামতত্ত্ববিদ এবং হানাফী মতবাদের অন্যতম বিশিষ্ট প্রবক্তা। ড. আবদুল করিম মনে করেন তওয়ামাহ্ ১২৮২ থেকে ১২৮৭ সালের মধ্যে সোনারগাঁওতে পদার্পণ করেন। বিস্তর গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। ৪. বাবা আদম শহীদ: সুফী মতাবলম্বী দরবেশদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাঙলায় আসেন বলে মনে করা হয়। তিনি বিক্রমপুরের রামপাল গ্রামে সমাধিস্থ। ৫. শাহ দৌলাহ শহীদ: কিংবদন্তী অনুসারে ইনি বিখ্যাত দরবেশ জালালুদ্দিন বুখারীর (১১৯২-১২৯১ খ্রী) সমসাময়িক। পাবনা জেলার শাহজাদপুরে এঁর সমাধি রয়েছে। ৬. শেখ জালালুদ্দীন তাব্রিজী: অতি বিখ্যাত দরবেশ। ইরানের তাব্রিজের সন্তান। খওয়াজা কুতুবউদ্দীন কাকীর "ফওয়াদ-অল-সালকীন"-এ এই মহান সন্তের বিবরণ রয়েছে। ইবন বতুতা তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তখন তিনি থাকতেন কামরূপ পর্বতমালায়। ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে তিনি দিল্লীতে এসেছিলেন। বেঁচেছিলেন ১৫০ বছর। ৭. শেখ জালালউদ্দীন কুনিয়ারী: আধুনিক তুরস্কের অন্তর্গত কুনিয়া নামক স্থানের আদি বাসিন্দা ছিলেন। শাহ জালাল নামে অতিপ্রসিদ্ধ। সিকন্দর খাঁ এবং শাহ জালাল শ্রীহট্ট জয় করেছিলেন। তিনি মহান সুফী, যোদ্ধা ও ধর্মপ্রচারক। পূর্ববাঙলা এবং আসামে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ৮. শেখ শরফুদ্দিন এহিয়া মনেরী: আইনজ্ঞ ধর্মবেত্তা, রসায়ন- ও পদার্থ-বিদ আবু তওয়ামাহ্ ছিলেন মনেরীর গুরু ও শ্বশুর। শিষ্যদের সঙ্গে এহিয়া মনেরীর আলাপ-আলোচনার সংগ্রহ "মলফুজ" নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই "মলফুজ"-সংকলনটি আবিষ্কার করেন অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারি। উপরে বর্ণিত এই সাধকবর্গ নিজেদের পাণ্ডিত্য, সাধুতা আর ধর্মনিষ্ঠার জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বাঙলায় ইসলাম-ধর্মের বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এঁদের অনেকের সঙ্গেই শাসকগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং বহুক্ষেত্রে তাঁরা এই দেশের রাজনীতিকেও প্রভাবিত করেছিলেন।

বাঙলায় তুর্কী মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের আগেই মুসলমানরা এদেশে বসবাস শুরু করেছিলেন কিনা, সে প্রশ্নে গ্রন্থকার লিখছেন যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে, বখতিয়ারের আগেই, কিছু-কিছু মুসলমান পদার্পণ করেছিলেন বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে ড. আব্দুল করিমের একটি বিশ্লেষণের উদ্বৃতি দিয়েছেন। 'চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যে আরবের মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই,···চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতেও আরবদের যোগাযোগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যেমন চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়, চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে 'না'-সূচক শব্দ ব্যবহারও আরবি ভাষার প্রভাবের ফল। চট্টগ্রামে একাধিক 'কদম রছুলের' অস্তিত্ব দেখা যায়। তা ছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকা যেমন, আল-করণ, সুলক বহর, বাকানিয়া ইত্যাদি এখনও আরবি নাম বহন করে।' [ বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল—পৃ ৫৫-৫৬ ]। এই সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের প্রণেতা অন্য একটি যুক্তির সংযোজন করেছেন। সেটি এই, চট্টগ্রাম বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ দুর্গ। এখনও সেখানে অনেক বাঙালি বৌদ্ধ বাস করেন। সুতরাং মুসলমান বিজয়ের আগে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ রাজাদের অধীন ছিল বলে মনে হয়। হিন্দু রাজারা সাধারণত অন্য ধর্মের লোক সম্বন্ধে গোঁড়া হতেন। সুতরাং তাঁদের রাজ্যে মুসলমানদের প্রবেশ এবং বসতিস্থাপন সহজসাধ্য ছিল না; কিন্তু বৌদ্ধ রাজাদের রাজ্যে তা সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল, যেহেতু বৌদ্ধ রাজাদের পরধর্ম সম্বন্ধে উদারতার অনেক প্রমাণ মেলে।

বাঙলায় মুসলমান বসতি-স্থাপন প্রসঙ্গে আমরা অন্য একটি যুক্তিরও উল্লেখ করতে পারি। শুধুমাত্র পীর-আউলিয়া, ওলি-দরবেশ নয়, বেতনভোগী তুর্কী-সেনার আক্রমণ ও বসবাসের নজিরও রয়েছে।

অশ্বারোহী সৈন্য হিসেবে তুর্কীরা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে তারা রাজা, সামন্তপ্রভুদের অধীনে চাকরি করত। গোবিন্দপাল ( ১১৫৫-৬২ ) 'তুরাকদণ্ড' নামে একটি রাজকরের প্রচলন করেছিলেন। বহিরাগত তুর্কী মুসলমানদের কাছ থেকে এই করটি আদায় করা হত। [ সূত্র : ড. সুশীলা মণ্ডল, "বঙ্গদেশের ইতিহাস ( মধ্যযুগ : প্রথম পর্ব )", কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ ৩৪ ( পরিশিষ্ট ), উদ্‌ধৃত, ড. ওয়াকিল আহমদ, "উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা" প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩, পৃ ৩ ]।

উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুর এবং পূর্ববঙ্গের ময়নামতীতে আব্বাসীয় খলিফা হারুনর রশীদের মুদ্রা পাওয়া গেছে। পাহাড়পুরের মুদ্রাটির তারিখ ৭৮৮ খ্রী। এই মুদ্রা আরব বাণিজ্যের লেনদেনের সাক্ষ্য বহন করছে বলে ইতিহাসবেত্তারা মনে করেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই মুদ্রা সংক্রান্ত বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করেন নি। এখানে ড. আব্দুল করিমের একটি বিশ্লেষণের বরাতও তিনিও দিয়েছেন। ( দেখুন, বা. মু. অ. আ, পৃ ১৪৪ )। মন্তব্যটি তর্কাতীত নয়। ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ারের আগমনের পরে মুসলমানদের ব্যাপক উপস্থিতির বিষয়টিতে আমরা সহমত পোষণ করি।

এই নয়টি অধ্যায়ের জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন প্রায় ১৪৯টি পৃষ্ঠা। পরিশিষ্ট অংশে ( ১৫০-২৩৫ পৃ ) ক. রায় লখমনিয়া ও লখনৌতি, খ. নওদীহ্‌ ও নবদ্বীপ, গ. নওদীহ্‌ ও নওদা, ঘ. মোহাম্মদ বখতিয়ারের নওদীহ্‌ আক্রমণ ও বিজয়, তিব্বত অভিযান, বাঁকমতি নদী, কানাই বড়শি গিরিলিপি এবং কামরূপের সীমারেখা এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ভিন্নমুখী মতের বিচার করেছেন। স্বীকার্য, আলোচনাটি কৌতূহলোদ্দীপক। এই অংশে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদিত "তবকাত-ই-নাসিরী"-বইখানি প্রয়োজন মতো বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন।

বর্তমান বইটিতে মুসলমানি নাম লেখার ক্ষেত্রে মাঝে-মাঝে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বলে লেখক স্বীকারোক্তি করেছেন। আরবি নামে 'গায়েন' অক্ষর থাকলে তা রোমান হরফে লিপ্যন্তর করার সময় 'গায়েন'-এর জায়গায় gh লেখা হয়। তার থেকে আবার যাঁরা বাঙলায় লিপ্যন্তর করেন, তাঁরা gh-কে 'ঘ' বানিয়ে দেন ; 'মুঘলক', 'তুঘলক' প্রভৃতি বানান এইভাবেই এসেছে। কিন্তু আরবি ফারসি ভাষায় 'ঘ' উচ্চারণ নেই। 'গায়েন'-এর উচ্চারণ পুরোপুরি 'গ' না হলেও 'গ'-এর কাছাকাছি। তাই সচেতন লেখক লিখেছেন 'মুগল', 'তুগলক', 'তুগরল' বা 'তুগরিল'-ইত্যাকার বানান। অবশ্য মুহম্মদ ঘোরী এই বানানও লিখেছেন। তুগরল খান আর বুগরাখানের মুদ্রার বর্ণনা ও চিত্র, উৎকৃষ্ট গবেষণাকর্মের নজির। কানাই বড়শী আর সিয়ান গ্রামের শিলালিপির চিত্র ইতিহাস-সচেতন পাঠকদের তৃপ্ত করবে। ৬০১ থেকে ৭৩৯ হিজরী সন খ্রীষ্টাব্দের যে মাসের যে দিনে আরম্ভ হয়েছে, তার উল্লেখ করে গ্রন্থকার ইতিহাস গবেষণার একটি মূল সূত্রকে মান্য করেছেন।

বলা দরকার যে, এই পর্বের বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে যিনি আজ 'সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ', যাঁর গবেষণা-কর্মের অশেষ সাহায্য নিয়েছেন, গ্রন্থকার সেই ড. আব্দুল করিমের নামে বইটি উৎসর্গ করেছেন।





## বনস্পতি নয়, তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড

**সুজিৎ ঘোষ**

"স্মৃতির মিনার" রত্নাংশু বর্গীর কবিতা-পুস্তিকা। অধিকাংশ কবিতাই চার থেকে ছয় চরণের। মাত্র দুটি কবিতা বারো ও বাইশ চরণ দৈর্ঘ্য লাভ করেছে, মোট কবিতার সংখ্যা মাত্র আঠারো। পুস্তিকার শিরোনামেই কবিতাগুলির সুর ধরা পড়েছে—রত্নাংশুর নানা প্রকীর্ণ স্মৃতি এ-কাব্যের লিরিক রূপের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো এক বৃহত্তর, মহত্তর সংঘবদ্ধ জীবনের অন্বেষণে বেরিয়ে কবি যেন ফিরে এসেছেন, বলেছেন, 'সজ্ঞ তোমার ভেঙে গেছে যৌবন' ( স্মৃতির মিনার ) বা 'সূর্য নেই পাখি নেই, বন্ধু নেই সজ্ঞ নেই' ( কান্নার চাপা ধ্বনিতে )। এই হতাশা-বোধ ও ব্যর্থতার মধ্যেও আছে আত্মসমীক্ষা, 'জানিনি কিভাবে ধ্বংসের ডাকে দিয়েছিলে তুমি সাড়া।' কিন্তু নিঃসীম নাস্তিতে কবি ও কবিতা বাঁচতে পারে না, 'আলোর পুরুষ' কবিতায় রত্নাংশুর স্বপ্ন প্রতিবিম্বিত। প্রতিটি কবিতাই মনে আঁচড় কাটে, কিন্তু প্রকীর্ণ কবিতার ক্ষণিকতায় মনে দাগ কেটে বসতে পারে না। অনেক কবিতাই পড়তে ভালো লাগবে, 'ঠাণ্ডা বরফ নদীর কথা / ছড়িয়ে আছে গানে / নীল কুয়াশা নীল নিরাশা / এইখানে সেইখানে / শুকিয়ে আছে পারুল বোন / শুকিয়ে কিরণমালা / দুখের কথা রইল গাঁথা / চম্পাবরণ পালায়।' ছাপা-প্রচ্ছদ সুন্দর।

প্রায় তিরিশটি কবিতা নিয়ে সুজিত সেনের "দু হাতেই ধূপদানি" কবিতাসংকলন। বাঁচার আকাঙ্ক্ষা, বেঁচে থাকার যন্ত্রণা, অমৃতের অনুসন্ধান ইত্যাদি মূল্যবোধ কবিতাগুলির অবলম্বন। ঋত্বিক ঘটক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোলায়েজের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি করে কবিতা। কবিতার চরণ ও আঙ্গিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "যত দূরেই যাই"-এর আঙ্গিকরীতি মনে পড়তে পারে। নাতিদীর্ঘ কবিতাগুলির বেশ কয়েকটি পড়তে ভালো লাগে। 'বোধন' নামের কবিতাটি যেমন, 'ভাবতাম : / শূন্যতায় ভরে যাবে বুক / দেখলাম : / এই আমি একা নয় / অসংখ্য মানুষ।'—কবির এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে সুজিতের চলার পথের পাথেয় হবে বলে আশা রাখি।

বিশ্বনাথ সিংহের "ভালোবাসা, একটু আলপনা" আটচল্লিশ পৃষ্ঠায় নিরানব্বইটি ছোটো কবিতার সংকলন। রীতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কণিকা-স্ফুলিঙ্গের রীতির সঙ্গে জাপানি কবিতার শব্দের ছবি আঁকার রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। যেমন, 'কাল সারারাত বৃষ্টি হয়েছে খুব। / কাল সারারাত আমি মাতাল হয়ে ছিলাম। / আমার সঙ্গী ছিল / পাতাল-পুরীর নিঃসঙ্গ অন্ধকার / আর রূপকথার গল্প।' অথবা 'জ্যোৎস্নায় ভরেছে ঘর। / তোমার স্বয়ম্বর, বুঝি এখনই হবে / কবে—সে কবে! / কপালে কুমকুম / দু'চোখে ঘুমঘুম / হৃদয় নিঃঝুম / কবে—সে কবে! / যেদিন আমার মৃত্যু হবে।' অর্থের পারম্পর্য নয়, কবির তাৎক্ষণিক হৃদয়ের অকৃত্রিম আবেগের দলিল এই ক্ষুদ্র কবিতাগুলি, পাঠকের অবসন্ন অবকাশের

---

**স্মৃতির মিনার**—রত্নাংশু বর্গী। প্রকাশক লেখক স্বয়ং। ১৯৮৯। তিন টাকা।

**দু হাতেই ধূপদানি**—সুজিত সেন। হাওয়া। ১৯৮৯। তিন টাকা।

**ভালোবাসা, একটু আলপনা**—বিশ্বনাথ সিংহ। উত্থক। ১৯৮৯। আট টাকা।

**রাঢ়ের মাটি, দক্ষিণের নোনা হাওয়া**—অজিত বাইরী। দে বুক স্টোর্স। ১৯৮৮। দশ টাকা।

**রোদ্দুরে হৃদয় রেখে**—সুনীল হাজরা। আশাবরী পাবলিকেশন। ১৯৮৮। দশ টাকা।

**নীল ঘোড়া সওয়ারবিহীন**—সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য প্রকাশন। ১৯৮৫। দশ টাকা।

**স্খলিত মুখ**—প্রদীপ রায়গুপ্ত। জলার্ক। ১৯৮৯। বারো টাকা।

মুহূর্তে মস্তিষ্কের ভার হরণ করবে। ছাপা-কাগজ-প্রচ্ছদ সুন্দর।

কবি অজিত বাইরী ইতিমধ্যেই গ্রামবাঙলার কবি বলে খ্যাতি লাভ করেছেন এবং গোটা ছয়েক বই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। অজিত বাইরীর পঞ্চান্নটি কবিতা নিয়ে "রাঢ়ের মাটি, দক্ষিণের নোনা হাওয়া" কাব্য-সংকলন। গ্রামবাঙলার প্রকৃতির সঙ্গে এ-কাব্যে এসেছে প্রেম। প্রথম কবিতাটিতে 'তোমাকে সাজাবো বলে' কবি বলেন 'তুমি এসো, তুমি দাঁড়াও সমুখে আমার / আমি তোমার নিরাভরণ কটিতটে / ঝুলিয়ে দেবো গুচ্ছ-গুচ্ছ পাতা। / আমি তোমার রাত্রির মতো ঘন / আর কালনাগিনীর মতো কুণ্ডলিত খোঁপায় গুঁজে দেবো পাখির পালক।' প্রতি কবিতায় প্রায় এই দহনহীন হার্দ্য উচ্চারণ লক্ষ করা যাবে। আবার গ্রামীণ সম্পর্কে মানবিক বিরোধের ক্ষেত্র-গুলিতে কবি নির্বিকার দর্শক হয়ে থাকেন না, বলেন, "এ জমি চৌদ্দপুরুষের চোখের জলে নোনা / এ জমি কালো ঘামের মতো কালো / এ আমার বাপের জমি। (এ আমার বাপের জমি) কিংবা, 'বাতাসে আজ কিসের কটু গন্ধ! / বাস্তু নয়; / নোনা ভেড়ি উজিয়ে আসে / জোতদারের নৌকো, / লেঠেল নামিয়ে লুঠ করে / বর্গাক্ষেতের ধান।' বক্তব্যের প্রকাশে কোনো আড়ম্বর নেই, মিথ্যাচারও নেই,—আবহমান কালের বর্গাদারের ওপর জোতদারের শোষণ শাসক পালটালেও থামে না তা কবি লক্ষ করেছেন। চিত্ররূপকল্প নির্মাণেও অজিত বাইরী পাঠকের মন ভরে দিতে পারেন কখন-কখন; চন্দনশুভ্র নিরাভরণ অতসী, রৌদ্র-শাসিত উঠোন, পাছা-রুগ্ন ন্যাংটো ছেলে, সুবর্ণ শেকড়গুছি, ধূমল পাহাড়, পুরুষের কাঁধে বাঁকা চাঁদের মতো টাঙ্গি ইত্যাদি চিত্রকল্প মাঝে মধ্যে চমক লাগায়। আর এসেছে নানা গ্রামীণ নিসর্গ ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ: ছো নাচের মুখোস, জোনাকির মালা, জীবনের সলতে, কুমিরের দাঁতের ধার, বাঘের চোখের আগুন, খোঁয়াড়ের পশু, পিটুলি পাতা, গাইটার বকনা-বাছুর প্রভৃতি। এ ছাড়াও, আঞ্চলিক বাঙলা ভাষায় রচিত 'পরব' কবিতাটি ভালো লাগবে, ভালো লাগবে 'নিরবতা' ও 'প্রেমের' কবিতা শীর্ষক কবিতাগুলিও এবং এ ছাড়াও অনেক কবিতা। অজিত বাইরী তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভবের স্বাধিকারের ক্ষেত্রটিকে অতিক্রম করে নাগরিকতার মুখোস পরতে চান নি। তাঁর অনুভবে আসছে এক আত্মবিশ্বাস এবং তদ্‌জাত এক তন্ময়তা। আশা করি আরো দীর্ঘ দিন অজিত বাইরী গ্রামবাঙলাকে তার নানা বৈচিত্র্যে পাঠকের কাছে তুলে ধরবেন। গ্রন্থের প্রচ্ছদ চমৎকার।

সুনীল হাজরার "রোদ্দুরে হৃদয় রেখে" কাব্যগ্রন্থটি উনিশশো চৌষট্টি সালে প্রকাশিতব্য কিন্তু অষ্টআশি সালে প্রকাশিত কাব্যসংকলন—এ কথা সুনীল-বাবুর নান্দীমুখ থেকে আমরা জানতে পারি। অতএব এই কবিতাগুলির ওপর দু যুগের সময় অতিক্রান্ত, যে সময়ে ভারত তথা এ-বঙ্গে হতাশা, দারিদ্র্য, পীড়ন, অস্থিরতা আজকের মতো তীব্রতর হয় নি। বরং পঞ্চাশের দশকের কবিতার আশাবাদ তখনও ইতস্তত ছড়ানো এবং সেই নিস্তরঙ্গ পটভূমিতে অস্থির যৌবন কখনো ক্রুদ্ধ, কখনো ক্ষুধার্ত কবিদের সংঘবদ্ধ কাব্য আন্দোলনের প্রেরণা যোগাচ্ছিল, সমস্ত রকম আঙ্গিকের রীতিকে ভেঙে ফেলার প্রয়াস, শ্লীল-অশ্লীলের প্রতি অপক্ষপাত থাকার প্রয়াস লক্ষ করা গিয়েছিল। এবং যে আন্দোলন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে প্রোথিতমূল ছিল না বলেই অচিরাৎ কবিতার বিচ্ছিন্ন অথচ দক্ষ শিল্পীরা প্রতিষ্ঠানের পরজীবী পুষ্পে পরিণত হয়েছিল।

সুনীলবাবু সেই কালের কবি। কিন্তু তিনি তাঁর কাব্যভাবনাকে ছন্দের বন্ধুর দুর্গে বন্দী করতে চেয়েছেন। 'রোদ্দুরে হৃদয় রেখে' একচল্লিশটি কবিতার সংকলন। সংকলনের অধিকাংশ কবিতাই ছন্দে রচিত







এবং সনেটকল্প বেশ কিছু কবিতায় সংহত আবেগ প্রাপ্তব্য। অক্ষরবৃত্তের প্রবহমানতা সুনীলবাবুর কবি-স্বভাবের অনুকূল বলে মনে হয়। সমসাময়িকতার চিহ্ন সুনীলবাবুর কবিতায় বিশেষ লক্ষ্যগোচর হয় না। অথবা সাময়িকতার থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবের অনুভবের প্রকাশ বলেই কবিতাগুলি রচনার দুযুগ পরেও আস্বাদ হারায় নি। স্বভাবে সুনীলবাবু রোমান্টিক। ফলে রোমান্টিক কবিদের উপজীব্য বিষয় সুনীলবাবুরও নির্বাচিত বিষয়াবলীর অন্তর্গত: প্রেম, প্রকৃতি ও অস্মিতা তাঁর কাব্যে বারে-বারে নানা ভাবে নানা রূপে প্রকাশিত হয়। অথচ ছন্দের শৃঙ্খলে আবেগের ফেনিল নভোচারিতাকে সংহত করেন কবি। অথচ অধুনা কবিতায় ছন্দকে শুধুই বন্ধন ভাবা হয়, ছন্দের যে ভাবকে শাসন করে সংহত করার ধনাত্মক ভূমিকা কাব্যের ক্ষেত্রে আছে, কার্যত তা অনেকে বুঝতে চান না। সুনীলবাবুর কবিতায়,—যা পাওয়া যায় নি, তার জন্যে কবির চিরন্তন আকুতি লক্ষ করা যাবে, 'দৃশ্যের গভীরে যাবো; অথচ ছায়ারা পিছু হাঁটে / হাজার বছর ধরে। কোথা সেই সমুদ্র সন্ধান', 'হাজার বছর ধরে' বাক্য-বন্ধটি মনে হতে পারে ইতিমধ্যেই অতি ব্যবহারে জীর্ণ, কিন্তু কবির ভাবনার যৌক্তিকতায় তা অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। 'নিজেকে নিয়ে' কবিতাটিতেও কবি ছন্দের বাঁধনে শব্দের এক মসৃণ পট নির্মাণ করেন। জীবনের স্বাদ, আমার নিয়তি আমি, তোমার আপন পৃথিবীতে, দুঃখবিলাসী, আমার দু'চোখে স্বপ্ন, গোপন প্রেমিক, চাই না স্মৃতির জ্বালা, বাতিঘর, সত্তার গভীরে ইত্যাদি কবিতা ছন্দ ও চিত্ররূপকল্পের সমাহারে আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। মাত্রা-ছন্দেও সুনীলবাবুর সংহত দক্ষতার পরিচয় পাই 'ইমনকল্যাণ' কবিতাটিতে, "অনুরাগের প্রদীপশিখা জ্বেলে / সঁপে দিলাম দিনের মতো প্রাণ; / বুক-জোড়া এ ভালোবাসার মাঠে / কঠিন হাতে সুরকে বাজালাম। / তোমার চোখের করুণ রাগিণীতে / কেঁপে উঠল ইমনকল্যাণ।' প্রচ্ছদ শোভন। সুনীল-বাবুর পরবর্তী পর্বের কাব্যগ্রন্থের অপেক্ষায় রইলাম।

সাতান্নটি কবিতা নিয়ে সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের "নীল ঘোড়া সওয়ারবিহীন" কাব্যসংকলন। কবি সুমন্ত্রর ছন্দের চেয়ে গদ্যরীতির কবিতার প্রতি টান বেশি, আঙ্গিকের চেয়ে বক্তব্যকে প্রকাশ করার দিকেই তাঁর মনস্কতা। তবু তার মধ্যেই আঙ্গিকের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস লক্ষ করা যাবে, যেমন 'বদলাবে কবে' কবিতায় লিপিকা বা অরুণ মিত্রের টানা গদ্যের সঙ্গে ভিন্ন ধরনের গদ্যের স্তবক নির্মাণ করতে দেখি। কিছু কিছু কবিতায় ছন্দপতন ঘটে, 'ধোপা এক ছিল তার স্বরগম ভারী' (পৃ ৭০) আট ও ছয় মাতার পর্বে শুরু হয়, কিন্তু তৃতীয় চরণে 'ফলে ধৈরত ও গান্ধারতার হলো ছুটি করে' এবং চরণে আর আট-ছয় এর পর্ব থাকে না, আবার চতুর্থ চরণে আট ছয়ের পর্ব এসে পড়ে। প্রতিটি চার মাত্রার পর্ব মনে করলেও বিন্যাসের সুস্থিতি, আসে না। কিন্তু গদ্যের সহজভাবে কবি সুমন্ত্র তাঁর বক্তব্য বলতে পারেন, 'মানুষ আসছে মানুষ আসছে মানুষ আসছে/ পৃথিবীর কত পরমায়ু!/ তার চেয়ে আরো ঢের বেশী/ মানুষের আয়ু—।' (মানুষের আয়ু)। এই মানব-কেন্দ্রিকতা অন্য বহু কবিতায়ও মিলবে, 'আসলে স্বেদবিন্দু ঝরানোটাই বড় কথা নয় / স্বেদ এমনিই ঝরে যেমন গা চিরলে রক্ত পড়ে / যারই সে গা হোক, সাধু বা চোর / মন্ত্রী বা প্রজা, হারামী কি খোজা / আসলে স্বেদের মূলে সৃজনের আবহই হল বড় কথা / যে সৃজনের আবহাওয়ায় মানুষ বলতে পারে, / পৃথিবী কেমন সুন্দরতর, দ্যাখো এই মানুষ সুন্দর যথা—।' এভাবেই সুমন্ত্র তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করেন, দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পায় 'আবহমানকালের উর্বরা ভূমি, / প্রণম্য জননী আমার / তুমি মা হও' (তুমি মা হও)। 'সিঁড়ি ভেঙে সমতলে' কবিতাটিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'সিঁড়ি দিয়ে আমি /

নামছি / নামছি / কবিতাটির বড় বেশি প্রভাব চোখে পড়ে। রীতির পৌনঃপুনিকতায় সব কবিতা ভালো না লাগলেও কিছু কবিতা ভালো লাগবে। ছাপা-কাগজ বাঁধাই প্রচ্ছদ উত্তম।

প্রদীপ রায়গুপ্তর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্খলিত মুখ' বাহাত্তরটি কবিতার সংকলন। এর আগে প্রদীপের ছোটগল্প চোখে পড়েছে, ভালো ছোটগল্প। এই বাক্যসংকলনে সংগৃহীত কবিতার সময়সীমা আঠারো বছর, অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছরে চারটি করে কবিতার নির্বাচন। বাঙলা সাহিত্যের কাব্যধারাটি তীব্র প্রতিযোগিতার মুক্ত অঙ্গন, এখানে একজন কবিকে নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবীর পাঠকমনে বেঁচে থাকতে হলে শুধু ভালো কবিতা লিখলেই হবে না, পরিমাণেও প্রচুর লিখতে হবে। তবেই পাঠক তাকে স্মরণ করবেন। কিন্তু, আঠারো বছরের বিশাল সময়-সীমায় প্রদীপের প্রথম কবিতা থেকে গ্রন্থভুক্ত শেষ-তম কবিতাটির ক্রমবিবর্তনটি লক্ষ করা যায় এবং বিষয়ের ব্যাপকতাও স্বাভাবিকভাবে এসেছে, যেমন শীতকালে বা কুমির, কর্ণ বা ইনটারভিউ, আঁরি রুশোর জিপসি বা নিহত ছেলের চিঠি—নানা বিষয়ে প্রদীপের কাব্যপরিক্রমা চলে।

সংকলনের প্রথম কবিতা 'শীতকাল'-এ যে সংশয় 'অনিশ্চিত ভবিষ্যতে আমিও কি হয়ে যাবো দারুণ দেবতা ?' বা 'সূক্ষ্ম অপরাধ মাংসের স্রোতের মতো নদীতে মিশেছে যেই, ওই ঘ্রাণে জেগেছে কুমির,/ আয়ুন্তে মানুষ পেয়ে ছুটে আসে দ্রুত খুব, আমাদের অপমৃত্যু হবে' (কুমির)—এ ধরনের বয়ঃসন্ধির নিরাশ্বাস থেকে বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে চলেন প্রদীপ, "মাঝরাতে নিদ্রাহীন অভিযোগে লম্বা হাত উঠে যায় আকাশের দিকে।' আবার মৃত্যুভাবনা কবিতাগুচ্ছে'র যে মর্বিডিটি, তা সরস্বতীর নৌকা'য় এসে আর অবশিষ্ট থাকে না, 'জলপ্রপাতের নিচে ভাসিয়ে দিলাম সরস্বতীর নৌকা/চিবুকের ডৌলে চন্দ্রমল্লিকার লাবণ্য/ প্রিয় পুরুষের মৃতদেহ ছেড়ে অনায়াসে ভেসে উঠতে চাও/প্রসূতি, সদনে/বাঘিনীর মতো অবলীলায় খেয়ে নিতে পারে/কাঠুরিয়া কিশোরের অপাপবিদ্ধ পৌরুষ/ তবে কেন দশ নখে চিরে ফেলছো না তোমার প্রসাধন/ ভেঙে ফ্যালো কমলবীণা, এক লাথিতে গুঁড়ো করে দাও প্রবাদপ্রতিম হাঁস/ওই দ্যাখো তোমার কাঙ্ক্ষিত নগ্নসকেরা ঘিরে ধরেছে তোমার নৌকা। গোগ্রাসে গিলতে চাইছে তোমার সমুদয় আপেল ও বিশল্যকরণী। প্রদীপের কবিতা সরল নয়, কবিতার মধ্যে এক জটিল মিশ্র ভাবনায় নিমজ্জিত কবিমনের পরিচয় মেলে। কিন্তু শব্দপ্রয়োগে অথবা ভাষাভঙ্গিতে প্রদীপ তথা-কথিত দুর্বোধ্যও নন। বরং মননের প্রতিবিম্বনে বহুধা বোধের একত্র সমাবেশের ঘনীভূত রূপের মধ্যে চিত্র-কল্পের উল্লম্ফনজাত জটিলতা কোথাও কোথাও লক্ষ করা যাবে। সে কারণেই, পাঠকের প্রস্তুতি থাকলে আঁরি রুশোর জিপসি, আম্রপালী, আর্নেস্ট হেমিং-ওয়ের বন্দুক বা পুরুরব-এর মতো কবিতা ভালো লাগবে। সেই প্রস্তুতি না থাকলেও অনেক কবিতার সংহত চিত্রকল্প বক্তব্যের সঙ্গে সাযুজ্যে সুখবেদ্য হয়ে ওঠে, যেমন সমর্পণ কবিতাগুচ্ছ-এর অন্তর্গত 'লখীন্দর' কবিতাটি : 'কে তুই সজলাক্ষী নারী ভাসিয়ে যাস মান্দাসে ?/ বাহুর বাধা ভেঙে অগাধ উঠছে জলের ভ্রূকুটি/তুই প্রকৃতির ঊর্ধ্বে যাবি !/একটি অথবা দু-টি/ পালকপাতে প্রপঞ্চ তোর পড়বে নুয়ে চারপাশে !/ অথচ ওই দেহের ভিতর নয়ন দুটি অন্ধ না ;/বিস্মৃতি কি মৃত্যু আমার, পরাভবের গ্লানি ? এ/মৃত শরীর নদীর জলে ভাসায়ে তুই যা গৃহে ;/ ফিরায়ে নে পূজা প্রণয়, বিষাদস্নিগ্ধ বন্দনা। আঠারো-উনিশ বছর ধরে রচিত প্রদীপের এই কাব্যসংকলনে সমকাল এসেছে, কিন্তু সমসাময়িকতার ছাপ বড় কম—এদেশে গত আঠারোবছরে নানা সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন, বিদ্রোহ ঘটে, পটপরিবর্তন হয়, একাধিক যুদ্ধ চলে, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা স্মরণীয় ঘটনা ঘটে, কিন্তু ডাইনি মা'র মতো দু-একটি কবিতায় ছাড়া প্রদীপের





কাব্যে সাময়িকতার ছায়া পড়ে না। অথচ 'ডাইনি মা' সাময়িক বিষয়ে হলেও সুলিখিত কবিতা। প্রদীপ কোথাও এক আপন প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করে তাঁর জটিল মানসের ভাবনা-আবেগকে নিজস্ব ভঙ্গিতে কবিতায় রূপ দিতে থাকেন। প্রদীপের গ্রন্থের ছাপা-কাগজ বাঁধাই প্রচ্ছদ চমৎকার। অতি সাম্প্রতিক এই কাব্য-গ্রন্থগুলিতে কবিদের প্রকরণগত নিয়ম-শৃঙ্খলের আয়াসসাধ্য প্রয়াস লক্ষ করা যাবে না, যা পাওয়া যেত বিষ্ণু দে বা অমিয় চক্রবর্তী, এমনকী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ে কবিতায়। এখনকার কবিদের কবিতায় প্রকরণের অনায়াস সিদ্ধি সত্ত্বেও স্বতন্ত্র ও স্বকীয় কবি-ভাষার অভাব লক্ষ করা যাবে। ত্রিশের ও পঞ্চাশের বনস্পতি কবিদের পাশে যেন এখন বাঙলা কবিতা স্নিগ্ধ পেলব, মসৃণ লতাগুল্ম তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড পেরিয়ে চলেছে ; যে ভূমি পেরোলে আবার দেখা মিলবে মহীরুহ কবিদের। প্রত্যাশায় দোষ কি ? আর এই তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডের মূল্যও অস্বীকার্য নয়।

# মতামত

১

## বাউল-ফকির নির্যাতনের ফতোয়া জারির মূলে ধর্ম নয়, থাকে ভিন্ন উদ্দেশ্য

শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদারের স্পর্ধিত অনুতভাষণে স্তম্ভিত হলাম (চতুরঙ্গ, জুলাই)। তিনি লিখেছিলেন, 'মুর্শিদাবাদে মুসলিম চাঁই সম্প্রদায় ইসলামবিরোধী গানবাজনা করেন বলে নিষ্ঠাবান মুসলমানেরা তাঁদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেন, প্রহার করেন, হত্যা করেন' (চতুরঙ্গ, মে)। তথ্যগতভাবে এই উক্তি শুধু 'ভুল' নয়, স্পষ্টত মিথ্যা এবং একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার। তাঁর 'প্রবন্ধের মূল স্পিরিট' যা-ই হোক, ওই স্থূল ও কদর্য মিথ্যারই প্রতিবাদ করেছি। জুলাই সংখ্যার পত্রে 'ঙ' অংশে তিনি নিজেই এই 'ভুলের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী', 'ভুলটি অমার্জনীয় তা স্বীকার করছি' এবং 'আমাকে অজ্ঞ বললেও তা স্বীকার করে নিচ্ছি' বলেও আবার রাশি-রাশি উদ্ভট মন্তব্য করে ক্ষান্ত হন নি, আমার প্রতি ব্যক্তিগত কটাক্ষ করেছেন, 'তবে শ্রীসিরাজের সাংবাদিকতার মাধ্যমে জানতে পারলাম তাঁর কোন কোন উপন্যাস মুর্শিদাবাদকে নিয়ে লেখা। সুন্দর বিজ্ঞাপন।'

চতুরঙ্গের পাঠকরা বিদগ্ধ ব্যক্তি। তাঁরা এই পুরনো ও চিরাচরিত সত্য সম্পর্কে অবহিত যে, একটা মিথ্যা বললে তা গোপনের জন্য অসংখ্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। আমি 'কোন কোন উপন্যাস মুর্শিদাবাদকে নিয়ে' লিখেছি, তা-ই বলেছিলাম? চাঁই সম্প্রদায় যে হিন্দু এবং তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজীবন কত ঘনিষ্ঠ, তার প্রমাণ দেওয়ার জন্যই তথ্য হিসেবেই চাঁই সম্প্রদায়ের জীবনের পট-ভূমিতে লেখা মাত্র দুটি উপন্যাসের উল্লেখ করেছিলাম। একই সঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রয়াত কালকূটের একটি উপন্যাসেরও উল্লেখ ছিল। চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতি এবং আন্দোলনের নেতা শ্রীতুলসী মণ্ডলের উল্লেখ করেছিলাম ঠিকানাসহ, যাতে দিব্যজ্যোতিবাবুরা তথাকথিত 'সমীক্ষা' (!) করার জন্য সঠিক ক্ষেত্রের সন্ধান পান।

দিব্যজ্যোতিবাবুর জানা উচিত, তিরিশ বছর ধরে লেখালেখি এবং দেড় শতাধিক উপন্যাস-গল্পসংকলন (লেখা যত ছাঁইপাশ হোক না কেন) প্রকাশের পর আমাকে নিজের বইয়ের 'বিজ্ঞাপন' দিয়ে নিজের ঢাক নিজে পেটানোর দরকার হয় না। প্রকাশকরাই এই কাজটি করার জন্য আছেন এবং তাঁরা তা করেন। কলেজস্ট্রীট পাড়ার নামী প্রকাশকবৃন্দের কাছে তিনি খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন, তাঁদের চাহিদামতো যোগান দিতে পারি না বলে তাঁরা ক্ষুব্ধ। নিজের কথা এভাবে বলতে আমি বিব্রত বোধ করছি। তবু বাধ্য হয়েই বলতে হল। দিব্যজ্যোতিবাবু বলিয়ে ছাড়লেন। স্বয়ং "চতুরঙ্গ"-সম্পাদক সাক্ষী। ধারাবাহিক উপন্যাস "অলীক মানুষ" শুরু করে অষ্টম কিস্তির পর বন্ধ করে দিতে বিজ্ঞপ্তি লিখে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সম্পাদক-মহাশয়ের পুনঃপুন তাগিদে সেটি চব্বিশ কিস্তি পর্যন্ত চালিয়ে শেষ করে দিই। আমার এইসব অকপট আত্ম-কথন আত্মপ্রচার নয়। আমি যে 'বিজ্ঞাপন'-লোভী নই, তা প্রমাণ করা। বহুলপ্রচারিত 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকের চিঠি এবং মৌখিক তাগিদেও গত তিন বছর ওই পত্রিকায় আমি একটিও গল্প লিখি নি। কারণ নিজের তাগিদে লেখা না এলে আমি এ বয়সে কিছু লেখা অনৈতিক মনে করি। দিব্যজ্যোতিবাবু অভ্যস্ত অসঙ্গতভাবে আমার স্পর্শকাতরতায় প্রগল্‌ভ





খোঁচা মেরেছেন। বিদগ্ধ বাঙালি সাহিত্য-সমালোচকরা সবাই জানেন, আমার অধিকাংশ লেখালিখিই মুর্শিদাবাদের পটভূমিতে। এই কথাটা আমাকে নিজের মুখে এতকাল পরে বলতে হবে? কী অদ্ভুত মন্তব্য! আমার উল্লিখিত উপন্যাস দুটি চাঁই-জীবন নিয়ে লেখা বলেই মুর্শিদাবাদের চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতি তাঁদের মুখপত্রে গর্বের সঙ্গে বহুবার উল্লেখ করেছেন। সম্প্রতি শ্রীতুলসী মণ্ডল তাঁর একটি প্রচার-পুস্তিকায় 'নির্জন গঙ্গা' সম্পর্কে আবার সস্নেহ উল্লেখ করেছেন। দিব্যজ্যোতিবাবুর 'সমীক্ষা'র আগ্রহ থাকলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। লোকনাট্য-দল 'আলকাপ' নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন (একজন আলকাপ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রিও অর্জন করেছেন) এবং করছেন, 'মায়ামৃদঙ্গ' তাঁদের সাহায্য করে। বই দুটি নিছক উপন্যাস নয়, ডকুমেনটেশনের প্রয়াস বলেই চাঁই সম্প্রদায় প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তদুপরি দিব্যজ্যোতিবাবুর স্থূল অজ্ঞতানিরসনেরও তীব্র প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম। কালকূটেরও 'বিজ্ঞাপন' দিয়েছিলাম!

দিব্যজ্যোতিবাবু তাঁর চিঠির 'ক' অংশে যা লিখেছেন, তা নিজেই খণ্ডন করেছেন 'ঙ' অংশে। তাঁর সাংবাদিকতার প্রকৃতি এবং 'দেশের মাটি ও মানুষ সম্পর্কে' পরিচয়-বিষয়ে আর মন্তব্য করতে চাই না। পাঠকের ওপর বিচারের দায়িত্ব ছেড়ে দিলাম। 'ঙ' অংশটি তাঁরা পড়ে দেখুন।

তাঁর 'খ' অংশ অসম্বদ্ধ প্রলাপ। 'ইসলাম-বিরোধী গানবাজনা' বলতে যে-গানবাজনা ইসলামের বিরোধী, তা-ই নয় কি? আমি তাঁর এই উক্তির সমর্থনে ব্যাখ্যা কখনই করি নি। আমি বলেছি, আউল-বাউল-ফকির-দরবেশদের গানবাজনা ইসলাম-বিরোধী নয়। ইসলামেরই অসংখ্য দার্শনিক ধারার একটি অংশ। এই বঙ্গে অজস্র সুফি-পীরের মাজার আছে। মেলা বসে। মুসলিম সাধকদের অসংখ্য আখড়া আছে। দিব্যজ্যোতিবাবু অন্তত বীরভূমের পাথরচাপড়িতে দাতাগীরের মেলায় যান। দেখুন সেখানে দরবেশি ও মারফতি সঙ্গীতের কী বিশাল আয়োজন। আমি কলকাতায় গোরাচাঁদ রোডের বাসিন্দা। পীর গোরাচাঁদের প্রকৃত মাজার ছাড়াও প্রতীকী মাজার অসংখ্য। গেরুয়া আলখেল্লাধারী সাধকদের নৃত্যগীত দেখে অবাক হবেন। তালিকা দিতে গেলে মহাভারত হবে। পুঁথিগত সাক্ষ্যে দেখুন মুগল-পারসিক-তুর্কি চিত্রকলায় দরবেশি নৃত্যগীতের ছন্দত শিল্পপ্রকর্ষ। সুফিদের ইতিহাস-দর্শন-সংক্রান্ত বইপত্র ঘাঁটলেই চোখ খুলে যাবে। ইসলামের একে-বারে আদিযুগের (সপ্তম শতক) মুতাজিলা দার্শনিক-দের ইতিহাসও উল্লেখ্য। সঙ্গীত ছিল এঁদের সাধনার মাধ্যম। প্রয়াত বাঙালি মৌলানা আকরাম খাঁ ছিলেন কট্টর ফরাজি। কিন্তু তাঁর "মোস্তাফা-চরিত" বইয়ে গানবাজনার সপক্ষে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ-সহ বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সাম্প্রতিক কালে ড. সুধীর চক্রবর্তী তাঁর "গভীর নির্জন পথে" বইটিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে বাঙালি মারফতি সাধকদের সম্পর্কে সাম্প্রতিক তথ্য প্রকাশ করেছেন। রাজনৈতিক অভিসন্ধি-প্রণোদিত সাম্প্রতিক মৌলবাদী শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবক্তাদের সঙ্গে তাঁদের প্রথাসিদ্ধ 'বাহাস' (বিতর্কসভা) হয়। দিব্যজ্যোতিবাবুর ঢালাও উক্তি 'শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবক্তারা আজ মুর্শিদাবাদ-বীরভূমে বলছেন, ইসলামে গানবাজনা নিষিদ্ধ' অনির্দিষ্টতাবাচক উড়োকথা শুধু নয়, অজ্ঞতার পরিচায়ক। 'বলছেন' মানে কী? ইসলামের প্রায় চোদ্দশো বছরের ইতিহাসে শাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে বহু বিষয়ে মতান্তর চিরাচরিত। কেউ-কেউ এমন কথা অতীতে বলেছেন বা এখনও বলে থাকেন তো বটেই। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সেই চিরাচরিত ও প্রথাসিদ্ধ রীতিকে অবাধ সাংবাদিকতার সুযোগে সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক ধূর্ত অভিসন্ধি ফলাও করে খুলে ধরছে। এখানেই আমার আপত্তি। আমার বাসার আশে-পাশে শাস্ত্রজ্ঞরা মাইক্রোফোনে মিলাদ বা কোনও

ধর্মানুষ্ঠানে তর্জনগর্জন করে বহু শাস্ত্রকথা বলার পর সেলামি নিয়ে প্রস্থান করামাত্র সেই মাইক্রোফোনে হিন্দি ফিল্মের গাইয়েরা গর্জন শুরু করেন, 'বোলো সুবাহ্-সাম। হরেকৃষ্ণ হরেরাম।' দিব্যজ্যোতিবাবু প্রয়াত মিশরি পণ্ডিত ইসমাইল 'ফারুকি এবং লু'মিয়া ফারুকির 'দা অ্যাটলাস অব ইসলাম' (ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক) পড়লে ইসলামের আদি-যুগ থেকে ইসলামি সঙ্গীতের পৃথক ধারার দলিল-প্রত্যক্ষ করবেন। দিব্যজ্যোতিবাবু 'হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের' কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি কি জানেন 'তবলা' আরবি শব্দ? 'সিতার' ফারসি শব্দ? 'তার' শব্দটাই ফারসি এবং 'একতারা', 'দোতারা'-ও ফারসি শব্দ। এখানে এক (Yek), দো/দু-ও ফার্সি। 'সি' মানে তিন। ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতে-নৃত্যে অসংখ্য টার্ম আরবি-ফারসি। প্রয়াত মার্কসবাদী পণ্ডিত রেমনড উইলিয়ামস *Key Words : A Vocabulary of Culture and Society* বইয়ে প্রায় ১০০টি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও শব্দার্থবিকাশের ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, কত সামাজিক-ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে ভাষার শব্দের মধ্যে। অনুগ্রহ করে পণ্ডিতি করছি, ভাববেন না। আমি বোঝাতে চাইছি প্রকৃত ঐতিহাসিক বাস্তবটা কী।

দিব্যজ্যোতিবাবুর মতে, তাঁর 'অভিযোগকে স্বীকার করেই' নিয়েছি আউল-বাউল-নেড়ার ফকির-দের ওপর একটু-একটু চাপ সৃষ্টির কথা স্বীকার করে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সুস্পষ্টভাবে আমি 'সেটা ব্যতিক্রম' বলার মানে নিশ্চয় তাঁর অভিযোগ স্বীকার করা নয়। চিঠিতে ব্যাখ্যার অবকাশ কম। আসলে 'চাপসৃষ্টি' ব্যাপারটা কী, বলি। গেরস্থবাড়ির সঙ্গীতপ্রেমী ছেলেপুলে আউল-বাউলদের সংসর্গে গিয়ে বাউণ্ডুলে হোক বা গাঁজা খাক, এটা কেউই পছন্দ করে না। সে হিন্দু হোক, কি মুসলিম। আমাদের গ্রামের কাছে বাল্যে একটি বোরেগিদের আখড়া ছিল। অর্থাৎ যাঁদের বাউল-বোষ্টম-বোষ্টুমী এসব বলা হয়। পাশের ব্রাহ্মণ জমিদার-অধ্যুষিত গ্রাম গোকর্ণের বাবুবাড়ির ছেলেরা সেখানে গাঁজা-বোষ্টুমীর প্রেম-সঙ্গীত বিবিধ কারণে আড্ডা জমাত। আখড়াটির উচ্ছেদ করা হয়েছিল। গোকর্ণেরই বিপত্নীক কিঙ্কর ছুতোর অজয়তীরে প্রখ্যাত বৈরাগীতলার মেলায় এসে এক বোষ্টুমীর প্রেমে পড়ে দীক্ষা নেয় এবং কণ্ঠীবদল করে গ্রামে ফেরে। গ্রামে তাকে একঘরে করা হয়। ১৯৪১ সালে আমি ক্লাস সিক্সের ছাত্র। গোকর্ণ হাইস্কুলে পড়ি। দুপুরে হইচই শুনে স্কুলশুদ্ধু ছাত্র বেরিয়ে দেখি, বোষ্টুমী এবং কিঙ্করের পূর্বপত্নীর গর্ভজাত অন্ধ ছেলে মৃত কিঙ্করের পায়ে দড়ি বেঁধে কাঁচা রাস্তায় টেনে নিয়ে চলেছে। মর্মান্তিক দৃশ্য। কিঙ্করের মড়া তার জ্ঞাতিরা ছোঁয় নি। টানতে-টানতে ওইভাবে নদীর ধারে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। শেয়াল-কুকুর-শকুন মচ্ছব করে খায়। প্রেমচন্দের 'সদ্গতি' এই বঙ্গে অন্যভাবে বাস্তব ছিল। দিব্যজ্যোতিবাবুরা ক্ষেত্র-গবেষণায় উৎসাহী হলে গোকর্ণ গ্রামে গিয়ে 'সমীক্ষা' করে আসুন।

ওই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা আছে। বাবা যখন তাঁর সঙ্গীতপ্রেমী বা কোনো ক্ষেত্রে ফকিরের সাধনসঙ্গিনীর প্রেমে আবিষ্ট ছেলেকে শাসন করতে পারেন না, তখন মসজিদে নামাজে সমাগত সমাজপতিদের শরণাপন্ন হন। ছেলের দলবল থাকলে এঁটে ওঠা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে তুরুপের তাসটি হল মাইনে-করা মৌলবিসাহেবকে দিয়ে শাস্ত্রবচনের ফতোয়া সংগ্রহ। তখন ব্যক্তিগত গার্হস্থ্য-মনস্তাত্ত্বিক লড়াইটি শাস্ত্রীয় সামাজিক জেহাদের ছদ্মবেশ ধারণ করে। ফকিরবাবাজির চেলারা শক্তিমান না হলে কিংবা সমর্থকের দল ভারী না হলে তাঁর দুর্গতি ঠেকানো যায় না। কিন্তু একটি জেলার লক্ষ-লক্ষ মুসলিমের মধ্যে কদাচিৎ এমন ঘটনা ঘটে থাকে। আজকাল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এটা কোথাও দেখলেই লুফে নেয়। ছায়ার সঙ্গে কুস্তি চালাতে শুরু করে। অতীতে অবিভক্ত বঙ্গে কোনো-কোনো আলিম 'বাউলধ্বংসের ফতোয়া' জারি করেছেন। এক্ষেত্রেও ব্যাখ্যা আছে। শাস্ত্রজ্ঞরা কেউ-কেউ সমাজে পসার-প্রতিপত্তির স্বার্থেই হরেক উটকো ছুতো ধরে তর্জনগর্জন জুড়ে দিতেন এবং এখনও দেন। এই শাস্ত্রজ্ঞদের নিরানব্বুই শতাংশ গরিব পরিবারের সন্তান। এঁদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা ইত্যাদি গুণ থাকলে স্বাভাবিকভাবেই লোকে আকৃষ্ট হয়। আমি নিজে শাস্ত্রজ্ঞ বা আলিম পরিবারের সন্তান। পিতৃদেব নিজের চেষ্টায় আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। বংশগত বৃত্তির অবসান ঘটে। নতুবা হয়তো আমিও গ্রামে-গ্রামে টুপি পরে দাড়ি নেড়ে পসার-প্রতিপত্তির স্বার্থে 'বাউলধ্বংস' কিংবা মৌলবাদী / শুদ্ধিবাদী জেহাদে নেমে পড়তাম। বাধ্য হতাম নেমে পড়তে। কিন্তু সে-ও নিষ্ফল তৎপরতা। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস চলে ব্যক্তি- বা গোষ্ঠীনিরপেক্ষ নিজস্ব নিয়মে। কত চেঙ্গিজ-তাইমুর-আতিলা-হিটলার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মানুষের ইতিহাসের গতিপথ তারা বদলাতে পারে নি। মোল্লা-মৌলভি তো কোন্ ছার।

দিব্যজ্যোতিবাবুকে কে বলল জনৈক অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা আমার 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' এবং তাঁর 'সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে'? নিরেট অনৃতভাষণ এটি। ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে কান্দি এলাকায় পুরন্দরপুর গ্রামের একটি পাঠাগারের অনুষ্ঠানে ওই নামের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে স্বল্প আলাপে আঁচ করেছিলাম তাঁর রাজ-নৈতিক আনুগত্য কোথায় এবং পরে বিশদ জানতে পারি। যাই হোক, ওঁর ভাষণে কিছু সাম্প্রদায়িক ওভারটোন লক্ষ করার পর অনুষ্ঠানে আলকাপদলের প্রাক্তন এক শিল্পী ফজর আলি মুখে-মুখে গান বাঁধেন আমাকে নিয়ে, 'পুরন্দর এসেছেন আজ পুরন্দরপুরে। তাঁর নামটি সিরাজ করেন বিরাজ আমাদের মাঝারে।' তারপর একের পর এক হিন্দু পৌরাণিক উপমায় পদ বাঁধতে থাকেন। তাঁর তখন মুখে সাদা দাড়ি, কপালে নিয়মিত নামাজ পড়ার দরুন কালো সেই ছোপ। আমার ভাষণে সেই অধ্যাপক ভদ্রলোকের উদ্দেশে বলি, 'এই আমাদের মাটি। এই হল প্রকৃত বাস্তবতা —এই ফজর আলি তার অনবদ্য প্রতীক।' কলকাতা ফিরে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় '৪৮০ ঘণ্টা ধরে ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগ' শিরোনামে একটি রিপোর্টাজে ফজর আলির কথা সবিস্তারে লিখি। পুরন্দরপুরেই কান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন কংগ্রেসবিধায়ক বঙ্কিম ত্রিবেদীর বাড়ি। তাঁরই উদ্যোগে ওই পাঠাগার এবং অনুষ্ঠান হয়েছিল। দিব্যজ্যোতিবাবুদের ক্ষেত্র-সমীক্ষার জন্য আর-একটি সন্ধান দিলাম।

যাই হোক, কোনো অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা আমার পক্ষে অশোভন হবে। তাঁর ছাপানো প্রচারপত্রের তথ্যকে আমি একটুও গুরুত্ব দিই না। শাহবানু-মামলার সময় একই-ভাবে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী থেকে ক্যাসেট প্রচার করা হয়েছিল। দিল্লির "মানুষী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমতী মধু কিশোয়ার তার মুখের মতো জবাব দিয়ে-ছিলেন। তাঁর নিবন্ধটি "দেশ" পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধে অনুবাদ করে আমি কিছু লোকের বিরাগ-ভাজন হয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথের আর্ষ বাণী 'সত্য যে কঠিন।' আমি কঠিন জেনেই সত্যকে ভালোবাসি। তাই লেখক হিসেবে পাঠক হারানোর ঝুঁকি নিয়েও এই বঙ্গে একা সলমন রুশদির বিরুদ্ধে লড়ে সত্যটাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম। এটা আত্মপ্রচার নয়, ঘটনা। রিলিজিয়নকে মানবতার শত্রু গণ্য করি বলেই রিলিজিয়নের ভয়ঙ্কর জাতক সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করি।

কাটরা মসজিদের ঘটনা সম্পর্কে দিব্যজ্যোতি-বাবুর সাংবাদিকসুলভ 'তথ্য' শোনা ব্যাপারটা নিজে সংবাদপত্রে চাকরি করি বলেই বিশদ বুঝি। ঘটনা হল, আমি মুর্শিদাবাদেরই মানুষ। ওই মাটির সঙ্গে

আমার নিবিড় সংযোগ অব্যাহত। আমি চৌত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের গ্রামে ছিলাম। পাঁচের দশকে মার্কসবাদী রাজনীতি এবং 'আলকাপ' দলে থাকার সময় ওই মাটির প্রতি ইঞ্চি আমার নখদর্পণে। নামে মুসলিম হওয়ায় আমার বাড়তি সুবিধা আছে, যা দিব্যজ্যোতিবাবুর নেই। তিনি একতরফা 'তথ্য' শুনেছেন। আমি দুতরফা 'তথ্য' জেনেছি। এলাকার বহু গ্রামে আমার আত্মীয়স্বজন ও হিন্দু বন্ধুরা আছেন। অসংখ্য পরিচিত মানুষ আছেন, যাঁরা তৃণমূলস্তরবাসী এবং নিরক্ষর। দিব্যজ্যোতিবাবু কি শুভ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক দীপঙ্কর চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী এবং বিশেষ করে আহমদ হাসানের ( "কলম" পত্রিকা ) প্রতিবেদন পড়েন নি? প্রকৃত তথ্যসংগ্রহে মনের বহুমুখিনতা প্রয়োজন। সত্যে পৌঁছানোর জন্য প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকরা 'দিয়ালোগো' পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। ভারতীয় দর্শনেও নেতি-নেতি দিয়ে ইতিতে পৌঁছানোর পথনির্দেশ আছে। 'এই বাহ্য, আগে কহ আর।'

দিব্যজ্যোতিবাবুর কাটরায় নামাজ পড়তেই যাওয়ার তথ্য কিন্তু মুসলিম সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদীদের হাত শক্ত করছে। মুসলিম লিগের হাসানুজ্জামান-প্রমুখ অপরিণামদর্শী নেতাদেরই বক্তব্যকে তিনি ভিত্তি দিচ্ছেন। তিনি জানেন না, হতাহতদের একাংশ ওই জমায়েতে ছিলেন না। ব্যক্তিগত কাজেকর্মে বেরিয়ে হাঙ্গামার বলি হন। আরও একটা কথা, 'ভিড়ের মানসিকতা' বা মবসাইকোলজির প্রবণতা ওই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়াশীল হতে বাধ্য। দিলীপকুমার-সায়রাবানু নেই, হাজি মস্তান নেই—যাঁর নাকি মুসলিম বেকারদের কর্মসংস্থানপ্রকল্প ঘোষণার কথা ছিল !! অগত্যা 'নামাজ' এই বিষয়টি মবসাইকোলজির কেন্দ্রীয় বিস্ফোরক-বীজ হয়ে ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল এমন একটা পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু বস্তুত তা হয় নি। 'কারবালা' গোরস্তানটি কি দিব্যজ্যোতিবাবু দেখেছেন? ওখানেই শেষাবধি নামাজ পড়তে যায় যারা, তাদের সংখ্যা স্থানটির নামাজপড়ার মতো ফাঁকা পরিসর জরিপ করলেই বোঝা যায়। একশো, কিংবা ধরে নিচ্ছি দুশো লোক নামাজ পড়তে জায়গা পাবে ওখানে। দফায়-দফায় তো নামাজ হয় না। নসিবুর স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে হত্যাকাণ্ড চলে। ট্রেনের লোকেরা যে নামাজ পড়তেই আসছিল, কী অলৌকিক শক্তিতে জানা যাবে? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, কাটরা মসজিদে নামাজ পড়ার অভিযান তো কিছু মৌলবাদীর কাছে জেহাদের তুল্য ছিল। অথচ জমায়েতে যারা এসেছিল, সবাই নিরস্ত্র! গ্রামীণ মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁরাই জানেন, গুজব ও নানা চমকপ্রদ প্রচার মুখেমুখে কীভাবে ছড়িয়ে যায় গ্রাম থেকে গ্রামে। গ্রামীণ মানুষ বরাবর বড়ো হুজুগে। হুজুগে মেতেই লোকেরা এসেছিল। পাল্টা গুজব ও হুজুগের আতঙ্কেই কিছু লোক তাদের ওপর হামলা করে। ঘাতক ও হতাহত দু-পক্ষই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির ভিকটিম মাত্র। এ জন্য দায়ী অপরিণামদর্শী কিছু রাজনৈতিক মতলববাজ লোক এবং সরকারি প্রশাসনের গুরুতর শৈথিল্য।

মুসলিম সমাজে জন্মসূত্রে জানি, নামাজ পড়াটাই যদি প্রকৃত উপাদান হত, তা হলে চিরাচরিত মুসলিম রক্তের ( আক্ষরিক অর্থে নয় ) ধর্মীয় ফ্যানাটিসিজমের জেহাদি তাগিদে লোকেরা গোপনে অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই যেত। ইসলামের ধর্মীয় অভিযান কখনই অহিংস ছিল না, হয় না। দিব্যজ্যোতিবাবু জানলে অবাক হবেন, মুতাজিলা এবং সুফিতত্ত্ব মরমিয়াবাদী দর্শন। অথচ প্রয়োজনে বহু মুতাজিলা এবং সুফিসাধক হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে হিংসাত্মক সংঘর্ষে নেমেছেন। এই সেদিনও বঙ্গে ফকির মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকিরবিদ্রোহ ঘটেছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে। ভারতীয় সন্ন্যাসীরাও একই পথের পথিক হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ মুসলিমপ্রধান জেলা। কাজেই ঘটনাটি ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা দরকার ছিল দিব্যজোতিবাবুর।





এত কথা বলতাম না। কিন্তু দিব্যজ্যোতিবাবু নিজের উদ্ভট এবং স্থূল অজ্ঞতা স্বীকার করেও আমাকে 'বিজ্ঞাপন'-প্রচারোন্মুখ বলে খোঁচা মারায় কথাগুলো ক্ষোভে-দুঃখে-হতাশায় বেরিয়ে এল। আমি সংবাদ-পত্রে সাংবাদিকতাবিভাগে চাকরি করি মাত্র। আমি 'সাংবাদিক' নই। এই দেশের ঐতিহ্য, মাটি ও মানুষই আমার অন্বেষণের বিষয়। ছাব্বিশ বছরের মহানগরবাস আমাকে এখনও গজদন্তমিনারে তুলতে পারে নি। আমি চায়ের দোকানে বসে 'তথ্য' শুনি না। আমার সৌভাগ্য, যে তৃণমূল স্তরের মানুষজনের মধ্যে বড়ো হয়েছিলাম, এই পরিণত বয়সে এখনও তারা আমার আপনজন। তাদের সঙ্গে নাড়ির যোগ এখনও ছিন্ন হয় নি। তাই 'মুসলমান চাঁই সম্প্রদায়' নামক দিব্যজ্যোতিবাবু-বর্ণিত সোনার পাথরবাটির মতো মুর্শিদাবাদের কোনো অধ্যাপকের 'ছাপানো প্রচারপত্রের তথ্য'কেও নিমেষে আরেকটি সোনার পাথরবাটি বলে চিনতে পারি।

**সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ**
কলকাতা-১৪

২

**পর্বতপ্রমাণ সামরিক ব্যয় কমানোর স্বার্থে ই প্রতিবেশী দেশগুলি নিয়ে একটি মৈত্রীক্ষেত্র গড়ে তোলা উচিত**

চতুরঙ্গের জুন সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সময়োপযোগী রচনা "হিন্দু-মুসলমান কী জয়!"-এর জন্য অভিনন্দন জানাই। অন্ধকার যতই গভীর হোক না কেন, যেমন একটি ক্ষুদ্র দীপশিখা তাকে দূর করতে পারে, তেমনি অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়-উল্লেখিত সময়য়ী হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার ধারা বর্তমানে দেশবাসীর একাংশকে আচ্ছন্নকারী হিন্দু বা মুসলিম গোঁড়ামির নিদান। ভারতীয় উপমহাদেশে একটা মৈত্রীক্ষেত্র গড়ে তোলার তাঁর রচনার উপসংহারের প্রস্তাবও অত্যন্ত সময়োচিত। অন্যান্য কারণ ছাড়াও অন্তত ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা কেবল স্ব-স্ব দেশের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নেই—এর রূপ আন্তর্জাতিক। পাকিস্তান বা বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রতি অন্যায় অবিচার যেমন এদেশের হিন্দুদের উত্তেজিত করে, ঠিক তেমনি এদেশের মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার ওই দুই দেশের মুসলমানদেরও উত্তেজিত করে। এ আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে, কোনো দেশের সংখ্যাগুরুরাই নিজ-দেশের সংখ্যালঘুপীড়নের ব্যাপারে আর সবাইকে চোখ বুজে থাকার পরামর্শ দিতে পারেন না।

সুতরাং মৈত্রীক্ষেত্রের প্রস্তাবটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে আরও দুইজন মনীষী এজাতীয় প্রস্তাব প্রকাশ্যে উত্থাপন করেছিলেন। এর প্রথম জন হলেন আচার্য বিনোবা ভাবে, যিনি এর একটা গাণিতিক সূত্র দিয়েছিলেন—ABC ত্রিভুজ। অর্থাৎ আফগানিস্তান, বার্মা ও সিলোন বা শ্রীলঙ্কা-সহ তার মধ্যস্থিত এলাকা। দ্বিতীয় জন ছিলেন ড. রামমনোহর লোহিয়া।

৪৩ বছর পূর্বে স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতবর্ষের মোট প্রতিরক্ষার খরচ ছিল ১০০ কোটি টাকা। অবিভক্ত দেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ বর্তমান ভারতের প্রতিরক্ষার খরচ বাড়তে-বাড়তে এ বছরের ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে ১৫,৭০০ কোটি টাকা। গত কয়েক মাস ধরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ-মানসিকতা তৈরি করা হয়েছে, তার ফলে বৎসরান্তে প্রতিরক্ষার বাস্তবিক খরচ ব্যয়-বরাদ্দ থেকে নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই তার আভাস দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সচিব মস্তেক সিং আহলুওয়ালার তথ্য অনুসারে এ বছরে এ খাতে মোট ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা ৩৫০০ কোটি টাকা। নূতন সরকার

প্রতিশ্রুত সামরিক বাহিনীর এক র‍্যাঙ্কের জন্য একই হারে পেনসন দিতেই এ বছর থেকে অতিরিক্ত খরচ হবে ৪০০ কোটি টাকা। গত কয়েক বছর ধরে বিশ্ববাসীর চোখে ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যয় কম করে দেখানোর জন্য প্রায় এক ডজন প্যারামিলিটারি বাহিনী (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, ইণ্ডো-টিবেটিয়ান বর্ডার ফোর্স ইত্যাদি) এবং সামরিক কর্মচারীদের প্রদেয় পেনসনের খরচ প্রতিরক্ষা বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। ওই খরচ যোগ করলে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যয় বাজেটের অন্তত ২০% হবে, আজ যা ১৫% থেকে ১৭% দেখানো হয়।

ভারতবাসীর মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় ১৯৮৮-৮৯ খ্রী প্রচলিত দামে (at current price) ৩৭৬০ টাকা অনুমান করা হয়েছে। বলা বাহুল্য ওই গড়ের মধ্যে টাটা-বিড়লাদের আয়ও ধরা হয় বলে, দারিদ্র্যের আসল চেহারা বোঝা যাবে দারিদ্র্যের সীমারেখার নীচের ভারতবাসীদের সংখ্যায় যাঁদের শতকরা হার ৩৩। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নের সংখ্যা এদেশে শতকরা ৩৭ জন। শুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই প্রায় ১ লক্ষ গ্রামে। কর্মহীনের সংখ্যা ৩ কোটির উপরে এবং পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় এত লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা সত্ত্বেও বেকারের বাহিনী ক্রমবর্ধমান। চিকিৎসা (কেবল শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ১৫) ও অন্যবিধ জনকল্যাণের কাজ নাকি অর্থাভাবে আশানুরূপ করা যায় না—এটা সব দলের সরকারেরই বক্তব্য। প্রতিরক্ষার এই অনুৎপাদক ব্যয়ের একটা বড় অংশ ঐসব কাজে নিয়োগ করলে দেশবাসীর কত কল্যাণ হত।

এ প্রসঙ্গে রাশিয়ার সাম্প্রতিক উথল-পাথলের অভিজ্ঞতার কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। ওদেশের অর্থব্যবস্থার প্রায় ধসে পড়ার অবস্থার জন্য সামরিক ব্যয়ের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। সম্প্রতি ওদেশের কমিউনিস্ট পার্টির যে ২৮তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল তাতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেভার্দনাজের (Shevardnadze) স্পষ্ট স্বীকার করেছেন যে আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজেটের একচতুর্থাংশ প্রতিরক্ষার খাতে খরচ করে রাশিয়া নিজের সর্বনাশ করেছে। তাই, 'ভবিষ্যতে আমাদের আর প্রতিরক্ষার প্রয়োজনই পড়বে না, কারণ বিধ্বস্ত দেশ ও তার দরিদ্র জনসাধারণের কোন সেনাবাহিনীর দরকারই পড়ে না।' (স্টেটসম্যান, ৪।৭।৯০)। রাশিয়ার মতো এত শক্তিশালী দেশের যদি এই হাল হয় তবে তার তুলনায় অনেক বেশি দুর্বল অর্থনীতির দেশ ভারতবর্ষের কি সামরিক বাহিনীর পিছনে এত খরচ পোষায়?

দরিদ্র পাকিস্তানের অবস্থাও আমাদের অনুরূপ, ওদেশের ৮৮-৮৯ খ্রী সামরিক ব্যয় ছিল ৫০০ কোটি টাকা। সাম্প্রতিক কালে নিশ্চয় আরও বেশি। মাথাপিছু হিসাবে পাকিস্তানের সামরিক ব্যয় ভারতের তুলনায় অনেক বেশি। ভারত যেখানে গ্রস ন্যাশনাল প্রডাক্টের ৩·৯% এই খাতে খরচ করে, পাকিস্তানের খরচ সেখানে ৬·৫%। ভারতে যেখানে ৬৯০ জন নাগরিক-পিছু একজন সৈনিক, পাকিস্তানে সেখানে ২১২ জন নাগরিক-পিছু একজন। সুতরাং পাকিস্তানবাসীর দুরবস্থার কথা অনুমান করতে অসুবিধা হবার কথা নয়। বাংলাদেশ ও এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তথ্যাবলী হাতের কাছে নেই। তবে একটি তথ্য আছে যার থেকে সামগ্রিক পরিস্থিতি অনুমান করা যায়। গত বছরে অনুন্নত দেশগুলি কেবল অস্ত্র খরিদের জন্য উন্নত দেশগুলিকে (এদের সংখ্যা সীমিত) ৩০ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে। বলা বাহুল্য, এই অস্ত্রসজ্জা নগ্ন ও উপবাসী থেকে।

এই সেদিন পর্যন্ত যাঁরা একই দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং জাতি, নৃ-বিজ্ঞান, রক্তসম্বন্ধ ও সমাজ-সংস্কৃতির দিক থেকে যাঁরা খুবই নিকট, পরস্পরের প্রতি কেবল অবিশ্বাসবশত তাঁরা দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা শিরোধার্য করে এইভাবে অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিযোগিতায় মেতেছেন! আর এর লাভ লুটছে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রে অস্ত্রের ব্যবসায় আমেরিকা, সোবিয়েত রাশিয়া, চীন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং পূর্ব ও পশ্চিম





ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র। তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে দুই-তিন বৎসর অন্তর অস্ত্রের প্রযুক্তিবিদ্যায় পরিবর্তন ঘটিয়ে ইতিপূর্বে কোটি-কোটি টাকায় কেনা অস্ত্রশস্ত্রকে বাতিল লোহালক্কড়ে পরিণত করে এক্ষেত্রে আধুনিকীরণের নামে আবার তাদের উপরিউক্ত কোন না কোন দেশের শরণাপন্ন হতে বাধ্য করা হচ্ছে। অস্ত্রসজ্জার রাজনৈতিক পরিণাম—এসব দেশের শরণাগত হবার সমস্যার কথাও এ প্রসঙ্গে ভুলে গেলে চলবে না।

এই প্রাণঘাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে এ অঞ্চলের মানুষদের বাঁচতে হলে এবং এতদঞ্চলের সম্পদের অধিকাধিক বিনিয়োগ দারিদ্র্য নিরাকরণের জন্য করতে হলে পারস্পরিক সন্ত্রাস সৃষ্টি ছাড়া অন্য পথ নেই। সেই দিক থেকে বিনোবা-লোহিয়া-হীরেনবাবুদের প্রস্তাব প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে।

ইউরোপে ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্স ও জার্মানির রাজনৈতিক, আর্থিক ও সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব অনেক শতাব্দীর। ফ্রান্স ও জার্মানির সঙ্গে বিরোধের ইতিহাসও বহু পুরাতন। তবু ঐসব দেশের প্রবুদ্ধ মানুষদের মধ্যে সদ্‌বুদ্ধি জাগার ফলে তাঁরা অতীতের বিবাদ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলে ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটের সূত্রপাত করেন। সকলের সমবেত চেষ্টায় আর্থিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার এই প্রয়াস সকলের পক্ষ হিতকারী প্রমাণিত হওয়ায় আরও বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। তারপর ইউরোপীয়ান কমিউনিটি এবং এমন কি ইউরোপীয়ান পার্লামেনটের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। ভারত-পাকিস্তানের বিরোধ আমেরিকা-রাশিয়া অথবা পূর্ব জার্মানি পশ্চিম জার্মানির বিরোধ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতো মূলগত নয়। দুই রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে সদ্‌বুদ্ধি জাগ্রত হওয়ায় জুলাই-এর প্রথমে "ন্যাটো"-র দেশগুলি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে যে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ এত দিনে সমাপ্ত। বৎসরাধিক কাল রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে অস্ত্রসজ্জা হ্রাস করার যে শুভ প্রয়াস আরম্ভ হয়েছিল তা ফলবতী হবার সূচনা দেখা দিয়েছে। যে কমিউনিস্টদের আটকাতে "ন্যাটো"-র সৃষ্টি তার আগামী সভায় তাই গর্বাচভ আমন্ত্রিত। রাশিয়াকে শিল্পোন্নত দেশগুলি (যারা আমেরিকার শিবিরের অন্তর্ভুক্ত) আর্থিক সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে সোভিয়েত অর্থব্যবস্থার উন্নতি হয়।

ইউরোপ আমেরিকার মত এ অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতাদের নেশন-স্টেটের বিড়ম্বনার দীর্ঘমেয়াদি কটু অভিজ্ঞতা নেই। তাই এই মুহূর্তে হীরেনবাবুর প্রস্তাবিত "মৈত্রী-ক্ষেত্র" সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ অগ্রণী হবেন বলে ভরসা হয় না। কিন্তু হীরেনবাবু এবং তাঁর মতো বুদ্ধিজীবীরা এর জন্য আহ্বান জানালে এ অঞ্চলের সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সাড়া দেবেন বলে মনে হয়। তাঁরা প্রত্যক্ষ ক্ষমতা-প্রাপ্তির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন বলে ক্ষমতা-প্রয়াসী রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নেতাদের সত্যকথনে যে অসুবিধা এবং সেই কারণে তাঁদের প্রতি মানুষের যে অবিশ্বাস, তাঁদের ক্ষেত্রে তা দেখা দেবার সম্ভাবনা কম। ভারত ও পাকিস্তানের বিগত তাল ঠোকাঠুকির মধ্যেই পাকিস্তানের এক বুদ্ধিজীবীদের দল সরকারি উদ্যোগে নয়, নিজেদের আগ্রহে এদেশে এসেছিলেন। তাঁদের উক্তি এবং গত ২৭শে জুন তাঁদের ও ভারতের মোট ৩০ জন বুদ্ধিজীবীর যে আবেদন প্রকাশিত হয়, তা এই সত্যের দ্যোতক। এরকম উদাহরণ আরও আছে। ভারত-বাংলাদেশের সম্বন্ধের বরফও গলছে। সম্প্রতি বিশ্ব জুড়ে পুরাতন ধ্যান-ধারণা বর্জন করে নূতনকে বরণ করার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই অঞ্চলেও এমন ডাক দিলে তা ব্যর্থ যাবে না বলে আমার বিশ্বাস।

**শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**
"চারু-নীড়", কামডহরি
গড়িয়া, কলিকাতা-৭০০ ০৮৪